বেদ-বাণী।

প্রথম প্রচার।

দ্বিতীয় আবৃত্তি।

প্রকাশক
শ্রীমতিলাল সেন, বি-এ।
বরিশাল।
১৩৩২ সাল।

মূল্য :— কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা।
কাপড়ে বাঁধাই ১।৵০ আনা।
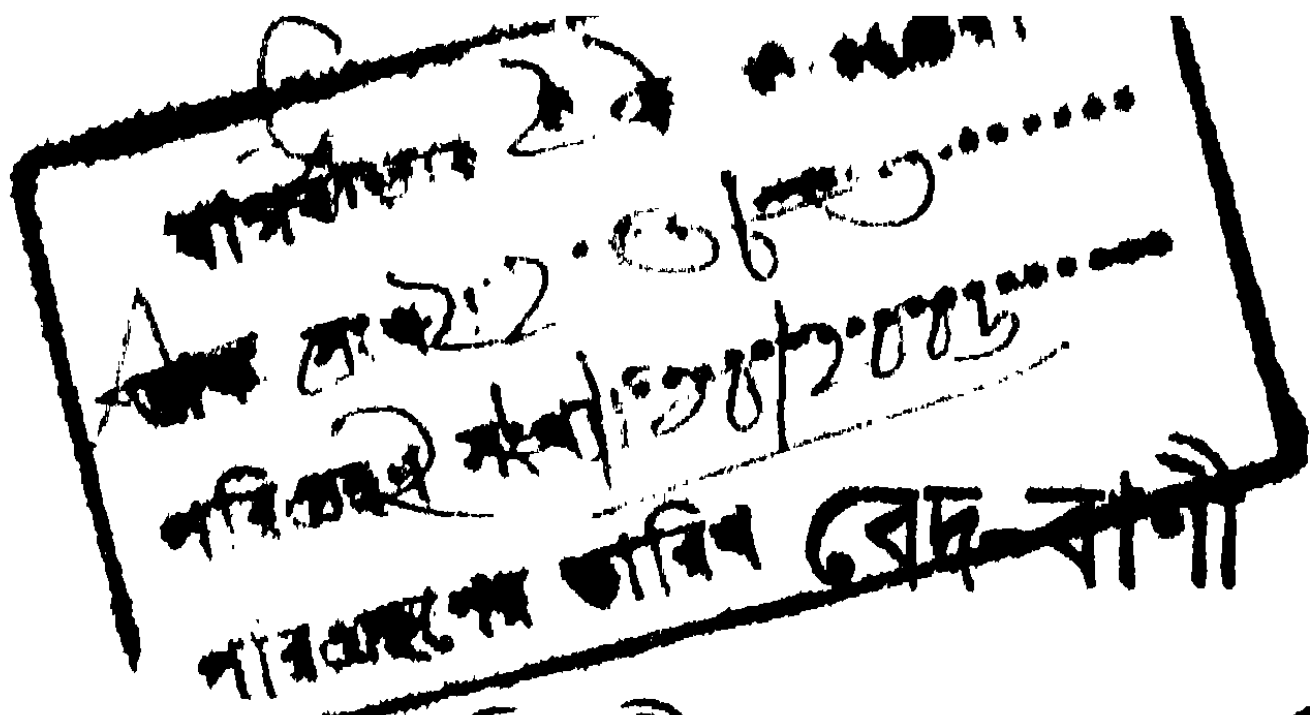
প্রথম ও দ্বিতীয় প্রচার প্রাপ্তির ঠিকানা ঃ—

১। শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার বসু,
২৯ নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা।

২। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্,
পটুয়াখালী, বরিশাল।

৩। শ্রীমতিলাল সেন, বি-এ,
চক্ বাজার, বরিশাল।

৪। ডাক্তার শ্রীরামানুজ চক্রবর্ত্তী,
১৪ নং ফর্‌ডাইস্ লেন, কলিকাতা।

৫। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ঃ—

প্রথম প্রচার ঃ—	কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা।
	কাপড়ে বাঁধাই ১।৴০ আনা।
দ্বিতীয় প্রচার ঃ—	কাগজে বাঁধাই ১।০ আনা।
	কাপড়ে বাঁধাই ১॥৴০ আনা।

কুন্তলীন প্রেস, ৬১নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।
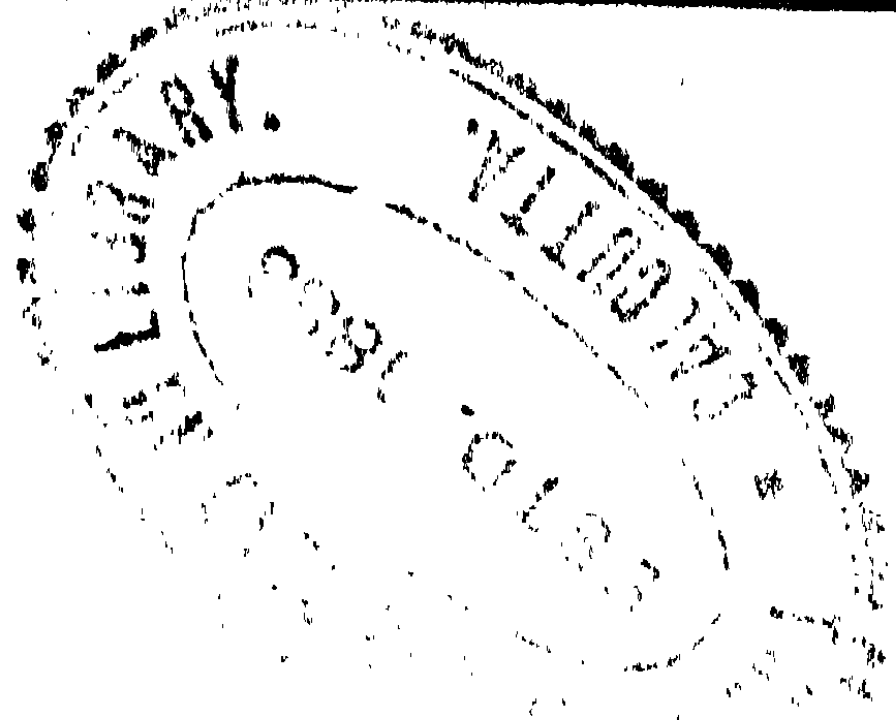
প্রকাশকের নিবেদন।

কোনও মহাপুরুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধকের কল্যাণার্থ যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকখানি মাত্র এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। উদ্দেশ্য—যদি আর কাহারও কল্যাণ হয়।

গ্রন্থোক্ত বিষয় সহজবোধ্য করিবার জন্য, পার্শ্ব-সূচী (Marginal notes) ও পাদ-টীকা (Foot-notes) যোগ করিয়া দিলাম।

ভগবান যদি সকল পত্র প্রকাশ করিবার শক্তি দেন, তবে সাধনার বিভিন্ন অবস্থার সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই জানাইতে পারিব। এ খণ্ডে তাহার অংশমাত্রই দিতে সমর্থ হইলাম।

সাধক! মনে রাখিবেন—"সকল ঔষধই যেমন সকল রোগীর জন্য নয়, সকল নিয়মও তেম্নি সকলের জন্য নয়"। এ গ্রন্থে সাধনার কত কথাই আছে, আপনার সাধন ভাবের যেটী অনুকূল, আপনি কেবল সেইটীই গ্রহণ করিবেন।

এই গ্রন্থের মধ্যে অধ্যাত্ম-রাজ্যের যে সকল তথ্য মিলিবে, তাহার একটীও অনুমান-কল্পনা-বা-অতিরঞ্জন-মূলক নহে; সকলই অনুভূতির কথা। আপনারাও সেই **জ্বলন্ত-সত্যকে** লাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা। ওম্।

প্রথম অনুবাক্।

ওঁ
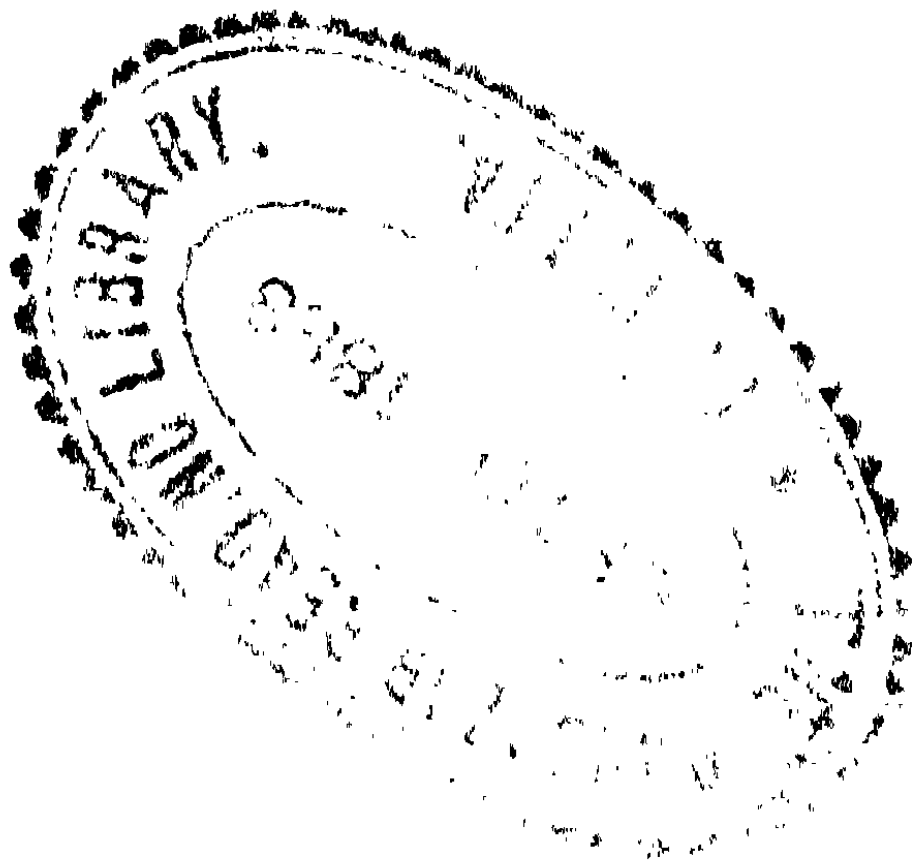
আকাশ ও বাতাস, দিবস ও যামিনী, মরণ ও অমরণ, —কিছুই যখন ছিল না, যাহা আছে এবং যাহা নাই, তাহার কিছুই যখন ছিল না, তখন কেবল **একই** বর্ত্তমান ছিলেন; সেই **এক** হইতে স্বতন্ত্র আর কিছুই ছিল না; 'কিছুনা'য় আবরিত হইয়া সেই এক চৈতন্য-সত্তা যেন মহাধ্যানেই বিরাজমান ছিলেন!*

ব্রহ্ম ও জগৎ

---

*নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥৩॥

ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ম মণ্ডল, ১২৯শ সূক্ত।

বেদ-বাণী

সে এক গভীরতম গভীরতা! সে এক অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য! সে এক সীমা-হীন অনন্ত!

সেই এক পরমাত্মাই যখন ছিলেন, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে বুঝিবে?

অন্ধকারে আবার অন্ধকারের প্রকাশ কি? অনন্তে আবার অনন্তের প্রকাশ কি? অদ্বৈতে আবার অদ্বৈতের প্রকাশ কি?

সেই **এক** প্রকাশিত হইলেন। লীলাই বল, স্বভাবই বল, আর যে কারণই বল, তিনি প্রকাশিত হইলেন।

অদ্বৈতের প্রকাশের জন্য দ্বৈত, অনন্তের প্রকাশের জন্য সান্ত, সুখের প্রকাশের জন্য দুঃখ, পরমাত্মার প্রকাশের জন্য জগৎ প্রয়োজন।

দুঃখই সুখময়কে প্রকাশ করিল। জড়ই চৈতন্যকে প্রচার করিল। অনিত্যই নিত্যের সন্ধান বলিয়া দিল। বহুই একের আভাস প্রদান করিল।

তুষার-মণ্ডিত হিম-গিরি তাঁহার মহিমা প্রকট করিল। সীমা-শূন্য অম্বুনিধি তাঁহারই গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করিল। তাঁহারই তেজ মার্ত্তণ্ডে, তাঁহারই সৌন্দর্য্য কুসুমে, তাঁহারই প্রেম মাতৃ-স্তন্যে,—তাঁহারই ক্ষমতা জগচ্চক্রে প্রকাশিত হইল।—অনন্ত প্রকারের অনন্ত চিম্‌ণীর (Chimney)

ভিতর দিয়া এক অনন্ত-জ্যোতির অনন্ত প্রকারের প্রকাশ হইল!

কে বলিবে, কেমন করিয়া এই সৃষ্টি হইল? সর্ব্বগত নিরঞ্জন চৈতন্য-দেব ব্রহ্মাণ্ড রূপে, বিরাট শরীরে প্রকাশিত হইলেন।

কি মহিমা-মণ্ডিত বিশ্ব-মূর্ত্তি! স্বর্গ তাঁহার মস্তক, ভাস্কর তাঁহার লোচন, পবন তাঁহার নিশ্বাস, আকাশ তাঁহার দেহ, পৃথিবী তাঁহার পদ!

কিন্তু, মনে করিওনা, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশেই পরমাত্মা নিঃশেষিত হইয়াছেন বা কমিয়া গিয়াছেন বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনই রহিলেন! এখনও তেমনই পূর্ণ, তেমনই স্থির, তেমনই অনন্ত, তেমনই এক-রস, তেমনই অবকাশ-বিহীন!

ব্রহ্ম-সমুদ্র যেমন ছিলেন, ঠিক্ তেমনই রহিলেন; অথচ ইঁহার মধ্যে, ইঁহারই শক্তিতে, ব্রহ্মাণ্ড-বুদ্‌বুদ্ উঠিল, ভাসিল, খেলিতে লাগিল! আবার, সেই বুদ্‌বুদের ভিতরেও, বাহিরেরই মত, এক অখণ্ড চৈতন্য-সত্তা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন! ইহা কেমনে হইল, কে জানে?

কিন্তু, বুদ্‌বুদ্ কতক্ষণ থাকে? চপলা কতক্ষণ নৃত্য করে? ব্রহ্মাণ্ডই বা কতক্ষণ থাকিবে?

বুদ্‌বুদ্ সাগরে বিলীন হইবে। যা কিছু আছে, তাও থাকিবে না; যা নাই, তাও থাকিবে না। কোন চিহ্নও থাকিবে না। কেবল **একই একের** উপর বিরাজ করিবেন। কেবল **একই** যেন মহাধ্যানে বিরাজমান থাকিবেন!

আর, এই **একের** ভিতরে যে বিশ্বের অভিনয়, ইনি তাহার নিয়ন্তা হইয়াও অচল, কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা, সর্ব্বগত হইয়াও নির্লিপ্ত! ইনি সর্ব্বদাই ধীর, স্থির ও শান্ত, 'শুদ্ধম্-অপাপবিদ্ধম্'।

এই যে বিশ্বের খেলা, ইহাকে সত্য বলিতে হয়, বল; মিথ্যা বলিতে হয়, বল; আর যা কিছু বলিতে হয়, বল; কিন্তু এ খেলা একবার দুইবারের জন্য নয়;—কতবার কত বিশ্ব, বুদ্‌বুদের মত, ইহাঁতে উঠিবে, উঠিয়া খেলিবে, খেলিয়া আবার ইহাঁতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। একটিও বরাবর থাকিবে না। কিন্তু, এই অবকাশ-হীন, বিকার-হীন, সম-রস **একই** একই ভাবে বরাবর ছিলেন, বরাবর আছেন, বরাবর থাকিবেন। এই এক চৈতন্য-সত্তাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। এই এক আনন্দ-স্বরূপই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

ভগবৎ-প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য

ইহাঁকে না পাইলে অভাব-বোধ ঘোচে না, সংসার-বন্ধন টুটে না, দুঃখের অবসান হয় না।

ইহাঁকে পাইলেই আনন্দ, ইহাঁকে পাইলেই তৃপ্তি,

ইহাঁকে পাইলেই শান্তি।

ইহাঁকে পাওয়াই জীবনের লক্ষ্য; ইহাঁকে লাভ করাই পরম পুরুষার্থ; এবং, ইহাঁকে পাইবার চেষ্টাই কর্ত্তব্য এবং একমাত্র কর্ত্তব্য;—তাহাই পুণ্য, তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার।

ইহাঁকে যদি এই শরীরেই লাভ করিতে পার, তবেই জীবন সফল।

ইহাঁকে পাইবার জন্য প্রাণ-পণ কর। 'ইহাঁকে না পাইয়া কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না'—বুদ্ধ-দেবের মত, এমন প্রতিজ্ঞা কর। উৎসাহের সহিত, অধ্যবসায়ের সহিত, নিপুণতার সহিত অগ্রসর হও।

কিন্তু, ইহাঁকে কেমন করিয়া পাইবে? চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, বাক্য যাঁহাকে বর্ণন করিতে পারে না, মন যাঁহাকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, যিনি সৃষ্টির অতীত এবং বুদ্ধির পর, সেই গুণাতীত পর-ব্রহ্মকে কেমন করিয়া মিলাইবে?

উপায়

উপায় আছে। 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্' হইলেও, তিনি ভক্তি-লভ্য, তিনি ভাব-গম্য।

মনকে বিষয়-বিমুখ করিয়া ভগবন্মুখী কর। সর্ব্বদা ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক।

ভগবানে যার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তার বেদ-পুরাণে প্রয়োজন কি? যে বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করিয়াছে, তার

বেদ-বাণী

দর্শনশাস্ত্রে প্রয়োজন কি? যে জগদ্গুরুর মঙ্গল-হস্ত সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছে, তার অন্য সাহায্যের প্রয়োজন কি? যার মন ভগবানে ডুবিয়াছে, তার জগতে প্রয়োজন কি?

সর্ব্বদা তাঁহাকে ভাব, তাঁহার চিন্তা কর, তাঁহাতে ডুবিয়া থাক, তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাও। নিত্য-স্মরণে, প্রহ্লাদের মত, কৃতার্থ হও।

৺কাশীধাম;
১১ই পৌষ, ১৩২৪।

ওঁ

নিরাপৎসু।

* * * দীর্ঘ পত্র লিখিতে বলিয়াছ; লেখা-পড়ায়, কথা-বার্ত্তায় আর বেশী ফল কি? উপনিষৎ বলেন ঃ—

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥

অনুভূতি

তাই, অনুভূতি চাই। বুঝিতে হইবে, ভগবানই সকল হইয়াছেন ও সকল করিতেছেন। সকল রূপই তাঁহার রূপ, সকল শব্দই তাঁহার নাম এবং সকল কর্ম্মই তাঁহার আনন্দ-লীলা। বৃক্ষের মর্ম্মরে, ভ্রমরের গুঞ্জরে, নদীর কুলু-ধ্বনিতে, ব্যাঘ্রের ভয়াবহ গর্জ্জনে, ক্রোধীর উত্তেজিত চীৎকারে এবং প্রেমিকের পবিত্র সঙ্গীতে প্রেমময়ের রসময় নামই শুনিতে হইবে। পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জনে এবং আত্মার্থে পর-পীড়নে সমভাবেই তাঁহার প্রেম-লীলা দর্শন করিতে হইবে। চিত্রকরের তুলিকা, কশাইএর ছুরিকা এবং দেব-মূর্ত্তির পুষ্প-মালিকা,—এ সকলই 'তিনি' বলিয়া মনে করিতে হইবে। আবার, যে অনন্ত-শক্তি বিধাতা এই বৈচিত্র্যময় অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্ত রূপ ধারণ করিতে পারিতেছেন, তিনি—সেই ইচ্ছাময় কৃপা-

নিধান ভক্তের মনোরঞ্জনের জন্য, আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত, উপাসকের ইচ্ছা ও প্রকৃতি অনুসারে, এক বা অনেক মূর্ত্তি যে ধারণ করিতে পারেন,ইহাও বুঝিতে হইবে। বুঝিবার জন্য প্রথমে বিশ্বাস, পরে আলোচনা ও চিন্তা করিতে হয়। চিন্তা করিতে করিতে বিশ্বাস উপলব্ধিতে পরিণত হয়। এবং এই প্রকার উপলব্ধি, সময়-ক্রমে উচ্চতর উপলব্ধি সমূহে সাধককে লইয়া যায়। তখন জ্ঞান ও ভক্তি, সাকার ও নিরাকার, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—এ সকল বিবাদ ও সন্দেহ চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করে।

কি কর্ত্তব্য

এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য, অবশ্যই, চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও ব্রহ্মচর্য্যবলে শরীর চল্লিশ বৎসর বয়সেও কর্ম্মক্ষম থাকিতে পারে, তথাপি ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা চল্লিশ বৎসর বয়সে যে কর্ম্ম-ক্ষমতা কমিয়া যাইবে, ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। তাই, একটু সময়ও যেন বৃথা ব্যয়িত না হয়। যে প্রকার বন্দোবস্ত করিলে সাধনের অধিকতম সুবিধা হয়, তাহাই করণীয়। যে কর্ম্ম ভগবান-লাভের সহায়, তাহাই কর্ত্তব্য,তাহাই পুণ্য এবং তাহাই মঙ্গলজনক; আর যাহা ভগবৎ-পথের অন্তরায়, তাহাই অকর্ত্তব্য, তাহাই পাপ এবং তাহাই অশুভের নিদান। লোকের মনরক্ষা করিবার জন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে সাধনের বিঘ্ন ঘটান মানসিক দুর্ব্বলতা মাত্র। সাধনের পক্ষে সকল প্রকার চঞ্চলতাই দোষজনক। এক প্রকার নিয়ম অনুসারে

বহুকাল চলিতে হয়। থাকা, খাওয়া, শোওয়া, সাধনকরা প্রভৃতি সকল কর্ম্মই সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মের সহিত চলা উচিত। * * * * * * *

তবে, যদি ভগবানে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা থাকে, 'যাহা যখন প্রয়োজন, তিনিই করিয়া দিবেন, মানুষের কোন হাত নাই, মানুষ তাঁহার হাতের পুতুল মাত্র'—এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে, তবে কিছুই করিতে হয় না। এ প্রকার সাধকের নিয়মিত ধ্যান, জপ কিছুই বেশী দিন থাকে না। গানে আছে ঃ—

'মদনের যাগ-যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়'।

এ অবস্থা আসিলে, 'সাধন করিব', 'মুক্তিলাভ করিব', 'ভগবদ্দর্শন করিব', এ সকল ইচ্ছাও থাকে না। তখন কেবল বলে, "তোমার ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ, করুণাময় স্বামি !" "ধনং মদীয়ং তব পাদ-পঙ্কজম্।" * * * * ইতি।

স্বর্গাশ্রম ;   শুভাকাঙ্ক্ষী—

১।১।'১৪   * * *

ওঁ

নিরাপৎসু।

চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লই।

অনাথ বালক

তোমরা ত কত লোককে দয়া কর,—একটি অনাথ বালককে আশ্রয় দিতে পার? ছেলেটির না আছে মা, না আছে বাবা; থাকিবার ঘর নাই, পরিবার কাপড় নাই। এর প্রতি কি তোমাদের দয়া হইবে?

ছেলেটি আশ্রয়ের জন্য কত লোকের নিকটে গিয়াছে! অন্ধকারময়ী রজনীর ক্রোড়ে যখন জগৎ নিদ্রা-সুখ-মগ্ন, তখন একটু আশ্রয়ের জন্য কত লোকের দুয়ারে ধাক্কা দিয়াছে! কিন্তু প্রায় কেহই দুয়ার খোলে না—কেহ সাড়া দেয় না—কাহারও ঘুম যেন ভাঙ্গে না! ডাকের পর ডাক শুনিয়া, ধাক্কার পর ধাক্কার শব্দ পাইয়া, ঘুম এক এক বার ভাঙ্গিলেও আবার অম্‌নিই নাক ডাকিতে আরম্ভ করে! এই বালকটির কথা কত লোকে শুনিয়াছে, কিন্তু কেহই এ বিষয়ে মনোযোগী হয় না। মনোযোগী হইবেই বা কেন? সংসারের লোক তে'লো মাথায়ই তেল ঘষে, ফিরে পাবার জন্যই দান করে। এখানে ত প্রেমের হাট নাই,—সর্ব্বত্র কেনা-বেচা—দোকানদারী! তাই, লোকে এ'কে

আশ্রয় দিতে চায় না। অবশ্য, ছেলেটির একটু দোষও আছে। সে বলে, "যে ঘরে আমাকে থাকিতে হইবে, সে ঘরে আর কেহ থাকিতে পাইবে না,—গৃহস্বামীও না। আমিই সে ঘরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইব।" কয় জনে তেমন ভাবে—অতিথিকে নাগমহাশয়ের মত—ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে? আরও একটু দোষ আছে,—সুযোগ পাইলেই, আশ্রয়দাতার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে! পওহারী বাবার মত ক'জন আছে যে জানিয়া শুনিয়া, ইচ্ছা করিয়া চোরকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবে? অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দের মত উন্মাদ কোথায় পাওয়া যায় যে হত্যাকামীকেও অবাধে প্রেম বিলাইবে?

সংসারের 'দয়ালু' বড়লোকদের আশা ছাড়িয়া দিয়া বালকটী আশ্রয়ের জন্য প্রায়ই বনে বনে, পাহাড় পর্ব্বতে—যেখানে ভিক্ষুগণ কিছু হারাইবার আশঙ্কা করে না—ঘুরিয়া বেড়ায়। বালকটি কিন্তু সদাই বলে, "যে আমাকে আশ্রয় দান করিবে, তার কোনই ভয় নাই।" এ প্রলাপ বাক্যেরই বা অর্থ কি?

ভগবানে আত্ম-বিসর্জ্জন

তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রয়োজন,—দেহরূপ দেবালয়-খানি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া,—সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সম্পন্ন করা—শরীর, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার সমুদয়ই, বিনা প্রত্যাশায়, তাঁহাকে অর্পণ করা। সরল ভাবে বলিতে হইবে :—

"নিবেদয়ামি চাত্মানং, ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।"

এই সঙ্কল্প ঠিক ঠিক হইলেই তাহার উত্তর হয়ঃ—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।"

এই যে আত্ম-নিবেদন, ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিসর্জ্জন, ইহার মধ্যে, লক্ষ্য করিলে, প্রেম-প্রবাহই দেখিতে পাইবে। প্রেম প্রত্যাশা রাখে না, দোকানদারী জানে না, স্বার্থপরতার ধার ধারে না। সে দিয়াই সুখী, সে পাইতে চায় না। 'ভাল না বাসিয়া পারি না—তাই ভালবাসি; কেন,—জানি না। ভালবাসিতে হয়,—তাই ভালবাসি। কিছুই চাই না। আমাকে যে ভাবে রাখিয়া তিনি সন্তুষ্ট, তাহাতেই আমি সুখী। তিনি কৃপা করুন্ বা না করুন্, আমি চাই কেবল তাঁকে ভালবাসিতে।'—ইহাই প্রেমের স্বরূপ। এই প্রেম লাভ করিবার জন্য ষোল-আনা মনই তাঁতে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হয়। চেষ্টা করিতে করিতেই চেষ্টা ফলবতী হয়।

কেহ বলেন, "যতই সাধন-ভজন করি, যতই আশা করি, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইবার নহে। তবে আর আশা করিয়া বৃথা অশান্তি ভোগ করিব কেন? যাঁর অঙ্গুলি-সঞ্চালনে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে; যাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে একটি সামান্য ধূলি-কণাকেও স্থান-ভ্রষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই; যে অনন্ত-মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের প্রত্যেকের উন্নতি এবং মুক্তির জন্য,

তাঁহার প্রেম-লীলার পূর্ণত্বের জন্য, প্রত্যেক জীবকে, প্রত্যেক জাতিকে ও প্রত্যেক জগৎকে প্রতি মুহূর্ত্তে শুভ পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন; যিনি আমাদের বাস্তব-মঙ্গল আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক জানেন ও ইচ্ছা করেন; আমাদিগের কর্ত্তব্য,—সমুদয় অজ্ঞানকৃত বাসনা ও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বথা তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করা। 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্' ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রার্থনা কখনও মানব-কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নাই।"

'ছোট আমি'কে ত্যাগ করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন দিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্রৌপদী যতক্ষণ লজ্জা নিবারণের জন্য হাতে কাপড় ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে "বিপদে কাণ্ডারি মধুসূদন!" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, ততক্ষণ অবিচলিত-প্রেমময়ের কর্ণে সে কাতর বিলাপ প্রবেশ করে নাই। কিন্তু যখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সরল মনে বলিলেন, "তোমারি ইচ্ছা হউক্ পূর্ণ, করুণাময়স্বামি!" তখনই সেই মনের অস্ফুট-বাণী ভগবানের বধির কর্ণে প্রবিষ্ট হইল—বস্ত্রের দীর্ঘতা দুঃশাসনের আসুরী শক্তিকে পরাজিত করিল!

যীশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "অনন্তশক্তি বিশ্ব-বিধাতাই সকল করাইতেছেন। তাঁহার নিকটে কিছুই অসম্ভব নাই,—এ কথা বিশ্বাস করিতে হইবে। যখন

কোথায়ও বক্তৃতা করিতে হয়, পূর্ব্বে তজ্জন্য প্রস্তুত হইও না। কারণ, প্রস্তুত হওয়া ত নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করা। যিনি মূককেও বাচাল করিতে পারেন, বক্তৃতা যদি তাঁহারই ইচ্ছায় হয়, তবে, পূর্ব্বে চেষ্টা না করিলেও তাঁহার শক্তি বক্তৃতা-রূপে তোমার ওষ্ঠদ্বয় হইতে প্রকাশিত হইবে।"

নির্ভরশীল ব্যক্তি কখনও মনে করে, 'যতদিন তিনি অহং রাখিবেন, ততদিন কেবল তাঁহারই নাম, তাঁহাকেই চিন্তা করিতে থাকি। এই শরীরকে যে ভাবে ইচ্ছা, রাখুন।'

আবার, কখনও কখনও সাধন ভজন করিতেও ইচ্ছা হয় না, নাম করিতেও ভাল লাগে না।

কখনও সাধক মনে করে, 'তিনিই সকল করাইতে-ছেন'; কখনও বা মনে হয়, 'তিনিই সকল করিতেছেন— সাধনও তিনিই করিতেছেন। কোন শরীরে মুক্ত হইয়া, কোন শরীরে সাধক হইয়া, কোন শরীরে বা বদ্ধ থাকিয়া সেই আনন্দময় প্রেম-লীলা সম্পাদন করিতেছেন।'

কখনও কেহ বলে, 'তিনিইত সকল করেন। আমি যে বিষয়-চিন্তা করি, নানা ব্যাপারে লিপ্ত আছি, এও ত তাঁরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা নয় বলিয়াই আমি সাধন করি না।' কথাটাতে সত্য আছে বটে; কিন্তু, যে ঠিক্ ঠিক্ মনে করে যে ভগবানই সকল করেন, যে ঠিক্ ঠিক্

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করে, সে ভগবানকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। সে যাই করুক্, জপ-ধ্যান করুক্ আর না করুক্, সর্ব্বকর্ম্মের-কর্ত্তা-ভগবানে মন থাকিবেই। এইটীই পরীক্ষা।

'আমি তাঁহাতে সর্ব্ব-সমর্পণ করিয়াছি, সেই বলেই তাঁহাকে পাইব', এ ভাবও থাকিবে না। কঠোর সাধনই কর, আর সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস ও নির্ভরই কর, আর যে উপায়ই অবলম্বন কর,— তাঁর কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য পন্থা নাই এবং কোন কর্ম্মই সেই পরমানন্দকে পাইবার পক্ষে প্রচুর নহে। তাই, সমুদয় বাসনা ত্যাগ করা চাই; সমুদয় চিন্তা বর্জ্জন করা চাই; সর্ব্বদা ভগবানে মন রাখা চাই। এই ভাবের চেষ্টা চলিতে চলিতে মন নির্ম্মল হইবে, অবিদ্যার গ্রন্থি ভিন্ন হইবে, হৃদয়ে শান্তিময়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

একটি বিশ্বাস থাকা চাই,—'তিনি যখন যা ইচ্ছা, তাই করিতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা হইলে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমাকে যে কোন রূপ ধারণ করিয়া দেখা দিতে পারেন। আমি যাহাই করি না কেন, যেমনই হই না কেন, কোন বাধা নাই।' সকল সময়ে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইতি।

স্বর্গাশ্রম; শুভাকাঙ্ক্ষী

৮।১।'১৪ * * *

ওঁ

নিরাপৎসু।

সকল বাসনা-কামনা ভগবানের পাদপদ্মে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—এরূপ পূর্ব্বপত্রে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু "আশা-পাশ-শতৈর্ব্বদ্ধ" ক্ষুদ্র মানব কেমন করিয়া তাহাতে সমর্থ হইবে? সে যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির করায়ত্ত হইয়াই রহিয়াছে! তাহার ইন্দ্রিয়গুলি যে আপাতমনোরম বিষয়-জালেই আবদ্ধ! সে যে দেহকেই আত্মা মনে করিয়া দৈহিক-সুখ-সাধনেই ব্যস্ত! সে যে কাহাকে আপন, কাহাকে পর মনে করিয়া আত্ম-রক্ষণে ও পর-দমনে সদাই নিযুক্ত! সে যে নানা প্রকার আশঙ্কায় সর্ব্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত! যাহারা ভাললোক, তাহারাও যে পর-দুঃখ-মোচনেচ্ছায় কাতর! এখন উপায় কি?

নিস্ত্রৈগুণ্য হই-বার উপায়

শাস্ত্র বলেন, কাঁটা দিয়া যেমন কাঁটা তুলিতে হয়, তেমনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইয়া রজ ও তম গুণকে পরাভূত করিতে হয়; পরে সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিলে গুণাতীত, আনন্দময় হওয়া যায়। প্রথমতঃ সাত্ত্বিক বিভীষণের সাহায্যে কুম্ভকর্ণরূপী তম ও রাবণরূপী রজ গুণকে পরাস্ত করিয়া, পরে লঙ্কার বিভীষণকে আবার

লঙ্কায়ই পাঠাইয়া দিতে হয়। ভগবান বলিয়াছেন,—

"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

অনেক সময়ে বহিরাবরণ দেখিয়া তামসকে সাত্ত্বিক বা গুণাতীত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তাই ত্রিগুণের প্রকৃতি বেশ করিয়া বুঝিতে হয়। গীতা এ বিষয় বেশ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাসনা

বাসনাগুলিকে ক্রমে ক্রমে ভগবন্মুখী করিতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি ও ভগবদ্দর্শন এই সকলই কামনা করিতে হইবে। এবং তন্নিমিত্ত, তৎসঙ্গে অন্যান্য ইচ্ছাগুলিকে দমন করিতে হইবে। যতই ভগবানের দিকে টান বাড়িবে, ততই অন্যান্য প্রবৃত্তি আপনিই সংযত হইতে থাকিবে। তারপর যা প্রয়োজন, ভগবানই করিয়া লইবেন।

ভগবদ্বিষয়ক কামনায় দোষ নাই। তুমি ওগুলি বেশ রাখিতে পার।

যে মনে করে, 'পুতুল-বাজীর পুতুল আমরা, যেমন নাচায়, তেম্‌নি নাচি'; যে চিন্তা করে, 'তিনিই সকল যন্ত্রের যন্ত্রী'; যে ভাবে, 'সাপ হয়ে কাট তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়'; যে দেখে, 'এত দয়া ও পরোপকারের চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীর দৈন্য, দুর্দ্দশা যেমন তেমনই আছে; দুঃখকে এক্-কালে তাড়াইয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব'; তার মন আর বেশী দিন বাসনা-কামনায় আন্দোলিত হয় না। যে বুঝিতে

আরম্ভ করে—'যখনই মনে তরঙ্গ উঠিতে থাকে, তখনই ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাই', তার মন কি আর কর্ম্মে আসক্ত হয়?

লোকের প্রকৃতি কি? সে সুখ চায়, দুঃখ চায় না। যে সুখটুকু পাই, তাহা ধরিয়া থাকিব; অথচ তৎসঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে-সম্বদ্ধ যে দুঃখটুকু, তাহা লইব না! তা হবে কেন? হয়, দুইই ছাড়; নয়, দুইই লইতে হইবে। এ সকল বিচার করা চাই।

যখন পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি মনে জাগে, তখন ভগবানে সমর্পিত-চিত্ত সাধক মনে করে, 'সকলই যখন ভগবানে সমর্পণ করা হইয়াছে, তখন আর আমি কর্ত্তা হইবার কে? কার জন্য কে কি কর্ম্ম করিবে?'

যদি সংসারের ছোট-খাটো সুখ ত্যাগ করিলে অনন্ত সুখ পাওয়া যায়, তা'তে ক্ষতি কি?

কিন্তু, মানুষ যতই বিচার করুক্, দেহে আত্ম-বুদ্ধি বশতঃ কামনা ও চাঞ্চল্য নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু, তজ্জন্য কোন আশঙ্কা করিতে হইবে না। সাধন-পথে-অগ্রসর মানব যখনই শক্তির অল্পতা বোধ করে, চড়াই উঠিতে হাঁপাইয়া পড়ে, তখনই দুর্ব্বলের বল দীনবন্ধু—"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" নির্জীব দেহে সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চারিত করেন এবং প্রয়োজন হইলে স্বয়ংই পথ-শ্রান্তকে বহন করিয়া লইয়া যান। এই জন্যই ত তিনি মঙ্গলময়;

আত্ম-সমর্পণ

এই জন্যই ত তিনি প্রেমময় পতিতপাবন! নহিলে, মায়া-জাল-জড়িত দুর্ব্বল মনুষ্যের উপায় কি? নহিলে, কোন্ আশ্বাসে, কোন্ বিশ্বাসে, কোন্ প্রাণে মানব তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিবে? "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—এই আশ্বাস-বাণী কি প্রেম-করুণাই ঘোষণা করিতেছে! গীতার কথা একটীও অবিশ্বাস করিও না। ভগবান যোগযুক্ত—সমাধিস্থ হইয়া গীতা বলিয়াছিলেন,—এ কথা মহাভারতে আছে।

যে যে প্রকারের লোকই হউক্ না কেন,—পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু—প্রত্যেকেরই কতকগুলি শুভ মুহূর্ত্ত আসে, তখন সে প্রশান্ত-চিত্ত থাকে। ঐ সময়ে যদি যথাসাধ্য সরল ভাবে বলে, 'ঠাকুর! তুমি আমার সমস্ত ভার গ্রহণ কর; আমি চলিতে পারি না, তুমি কোলে করিয়া লইয়া যাও। আমি আশা-পাশে বদ্ধ, মোহ-মদিরায় অচেতন, ভাল-মন্দ বুঝিতেছি না,—তুমি আমার মঙ্গল কর। আমি সাধন জানিনা, কৃপা করিয়া তুমি আমায় দেখা দাও'; তাহা হইলে, সে কথা ভগবানের কর্ণে নিশ্চয়ই পহুঁছিবে; ক্রমে ক্রমে ঐরূপ শুভ মুহূর্ত্তের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে এবং অনন্ত করুণার বিশাল দ্বার তাহার জন্য চির-মুক্ত হইবে।

প্রথম প্রথম অনেক চাঞ্চল্য হয়। একবার আত্ম-সমর্পণ করিলাম; একটু পরেই অহং আসিয়া আমার

অজ্ঞাতসারে কোথায় লইয়া গেল! যখনই টের পাই, তখনই পুনরায় আত্ম-সমর্পণের সঙ্কল্প করিতে হয়। এই-রূপ করিতে করিতেই অহঙ্কার ও চাঞ্চল্য দূর হয়।

তাই বলিতেছি, কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই। যে অবস্থাপন্নই হও না কেন, যত অধিক সময় ও যত অধিক বার সম্ভব, তাঁর দিকে তাকাইয়া থাক। তিনি নিশ্চয়ই কোলে তুলিয়া লইবেন। যাহা প্রয়োজন, সকলই ঘরে বসিয়া পাইবে। অনেক বড় লোকের ছেলে স্কুলে যায় না; শিক্ষক বাড়ী আসিয়া পড়াইয়া যান। 'মায়ের-ছেলে' রামকৃষ্ণের শিক্ষার জন্যও শিক্ষকগণ যথাসময়ে বাড়ীতেই আসিতেন। আবশ্যক হইলে ভগবান নিজেই ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ—আরও কত কি—শিখাইয়া দিয়া থাকেন।

মনে রাখিও, তাঁহার একটা দুর্ব্বলতা আছে; চোখের জল—সরল হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন মোটেই সহ্য করিতে পারেন না! ধ্যান করিতে পারিতেছ না?—একবার কাঁদ দেখি; দেখিবে—পর মুহূর্ত্তে ধ্যানে সজীব মূর্ত্তি আসিয়াছে।

আরও একটী কথা। যত কিছু কর্ম্ম হইতেছে, যত কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, ভগবানই সে সকলের একমাত্র স্বাধীন কারণ। 'এইটী ঘটিয়াছে, অতএব এইটী হইবেই',—ইহা ঠিক্ নহে। ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা,

তাহাই সংঘটিত হইতেছে ও হইবে। তাঁহার রাজ্যে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই। তোমার কনিষ্ঠা কন্যা পিচ্ছিল ময়দানে দৌড়িতেছে বলিয়াই যে সে আছাড় খাইবে, এমন নয়। অনেকেই ও অবস্থায় আছাড় খায় বটে ; কিন্তু সকলকেই আছাড় খাইতেই হইবে, ইহা মিথ্যা কথা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে আছাড় খাইতেও পারে, আবার তাঁর ইচ্ছা হইলে ঐ স্থানে দৌড়াইলেও সে পড়িয়া যাইবে না। তাঁর ইচ্ছাতে অনেক লোকেই ঐ ভাবে দৌড়াইতে যাইয়া আছাড় খায়। আবার, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে সকলেই আছাড় খাইবে। আছাড় খাওয়া না খাওয়া পিচ্ছিলতার বা দৌড়াইবার বা অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না ; সর্ব্ব-কর্ম্মের কর্ত্তা ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। বিশ্ব-সাম্রাজ্যের যিনি আইন-কর্ত্তা, সেই সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছা করিলে কোন সময়ে কোন আইনের ব্যতিক্রম করিতেও সমর্থ। তাঁহার ইচ্ছাতে রক্ত-জবার গাছে সাধারণতঃ লাল ফুলই ফোটে বটে ; কিন্তু, কখনও সাদা ফুল ফুটিতেও পারে। এটী চিন্তা করিও এবং সমুদয় বাসনা ও চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার উপর মির্ভর করিতেই যত্নশীল থাকিও।

ভগবানের মঙ্গলময়ত্ব

নির্ভরতার ভিত্তি কি, জান ? 'তিনি মঙ্গলময়, প্রেমময়' —এই বিশ্বাস। ইনি [illegible] স্তা ও বিচার দ্বারা দৃঢ়

করিতে হয়। 'তিনি সর্ব্বদা সকলের মঙ্গলই করিতেছেন ; আমরা অজ্ঞান-বশতঃ যাহাকে অমঙ্গল মনে করি, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে মঙ্গলই' ; এই সত্যটী বিশ্বাস ও উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা অনেক সময়ে চাঞ্চল্য আসিবে। একজন কোন এক প্রকারের সাধন করিয়া বেশ উন্নতি লাভ করিল ; অমনি মনে হয়, 'আমি কেন নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি ? আমারও ঐরূপ করিলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধি লাভ হইত।' কিন্তু, ঐ পন্থা অবলম্বন করিলে যে তোমার অধিকতর সময় লাগিবে না, বা কোন প্রকারের অসুবিধা ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ কি ? আর তুমি কোন্ শক্তিমান যে নিজের বলে সিদ্ধি লাভ করিবার আস্পর্দ্ধা কর ? ফলতঃ, 'নিজে কিছু করিতে পারি'—এই বিশ্বাস যতদিন থাকে, ততদিন ঠিক ঠিক নির্ভরতা আসে না।

অবোধ মানব বোঝে না যে যাহার যেরূপ ঔষধের প্রয়োজন, বৈদ্যরাজ তাহাকে তাহাই দিতেছেন। মা এক ছেলেকে মাছ-ভাত দিলেন, এক ছেলেকে সাগু দিলেন, আর এক ছেলেকে কিছুই দিলেন না। এ বিভিন্ন ব্যবস্থা যে ছেলেদের মঙ্গলের জন্যই। ইহা যে মায়ের প্রেমেরই পরিচায়ক। যেখানে প্রেম নাই, সেখানেই পেটেণ্ট ঔষধ ;—সকলের জন্য একরূপ ব্যবস্থা। প্রেমের রাজ্যেই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ব্যবস্থা।

বলিতে পার, 'তিনি যদি মঙ্গলময়ই হন, তবে জগতে এত রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, জরা-মৃত্যু কেন?' ইহার উত্তরে তোমাকে এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে তুমি আত্মা, তুমি শরীর নহ। আত্মার বিকাশের জন্যই শরীর। আত্মার উন্নতির জন্য ভগবান শরীরকে কখনও সুখে, কখনও বা দুঃখে নিপাতিত করেন। আবার, বর্ত্তমান শরীর দ্বারা যতটুকু কার্য্য হইবার সম্ভব, সে-টুকু পূর্ণ হইলেই অধিকতর উন্নতির জন্য, উৎকৃষ্টতর শরীর লাভের নিমিত্ত, তিনি পুরাতন জীর্ণ শরীর ত্যাগ করাইয়া থাকেন।

ছাত্র যখন পাঠশালায় বেত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়, রোগীর স্ফোটকে যখন অস্ত্র-প্রয়োগ করা হয়, তখন শিক্ষক ও চিকিৎসককে কি কেহ অমঙ্গলকর মনে করে?

আছাড় খাওয়া কষ্টকর বটে, কিন্তু আছাড় খাইতে খাইতেই ছেলে দাঁড়াইতে শিখে। একবার আগুনে আঙ্গুল পুড়িলেই শিশু সতর্ক হয়। নতুবা শুধু উপদেশে লোক প্রস্তুত হয় না।

রোগের ভয়, সমাজের ভয়, আইনের ভয় না থাকিলে কি সাধারণ লোক সংযমী হইত? অপমান এবং লাঞ্ছনা, অনুতাপ এবং বিবেকের দংশন কত লোককে উন্নত করিতেছে!

অন্য দিকে, আবার, মনে কর, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভীমসেন

যখন ভগবানের আদেশ সত্ত্বেও অস্ত্রত্যাগ করিলেন না, তখন বৈষ্ণবাস্ত্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানই তাঁহাকে আবৃত করিলেন !

পত্রে আর কত লিখিব? সাধন-পথে যতই অগ্রসর হইবে, ভগবানের মঙ্গলময়ত্ব তোমার নিকটে ততই অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। বর্ত্তমানে, বিচার করিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে, আর বাকীটুকু বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে,—'প্রত্যেক জীবের পক্ষে যেমন, সমাজ এবং জগতের পক্ষেও তেমনি,—ভগবান সদাই প্রেমময় এবং মঙ্গলময়'।

সূর্য্যের তেজ সর্ব্বত্রই সমান ভাবে পতিত হয়। সেখানে মুড়ি, মিছ্‌রির সমান দর। ভক্তের প্রতি অধিক প্রেম, অভক্তের প্রতি ঘৃণা বা অল্প প্রেম—ইহা ভগবানের রাজ্যে নাই। বিশ্ব-জননীর নিকট সকল সন্তানই সমান প্রিয়। তিনি সকলকেই বিভিন্ন পথ দিয়া একই স্থানে লইয়া যান। শিব প্রত্যেককেই শিবত্ব দান করেন। তিনি সম-দর্শন। বড় নদী ও ছোট নদী সমুদ্রে পড়িলে কি আর তাহাদের ভেদ থাকে?—উভয়েই সমুদ্র হইয়া যায়। যমুনার পবিত্র সলিল আর নর্দ্দমার দুর্গন্ধময় বদ্ধ-জল, জাহ্নবীতে পতিত হইলে উভয়েরই ভেদ ঘুচিয়া যায়; উভয়েই তখন গঙ্গারূপে

জগৎ-পাবণী শক্তি প্রাপ্ত হয়। তাই, ভয় পাইও না, সন্দেহ করিও না, অবিশ্বাসী হইও না। অকুতোভয়ে, প্রশান্তচিত্তে, বিনা প্রত্যাশায়, অনুরাগের সহিত, তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন কর ; সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাঁহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়। অমৃত-কুণ্ডে ডুবিয়া থাক। চির-অমরত্বের ইহাই সনাতন পন্থা।

স্বর্গাশ্রম ;
১৪।১।'১৪

* * *

ওঁ
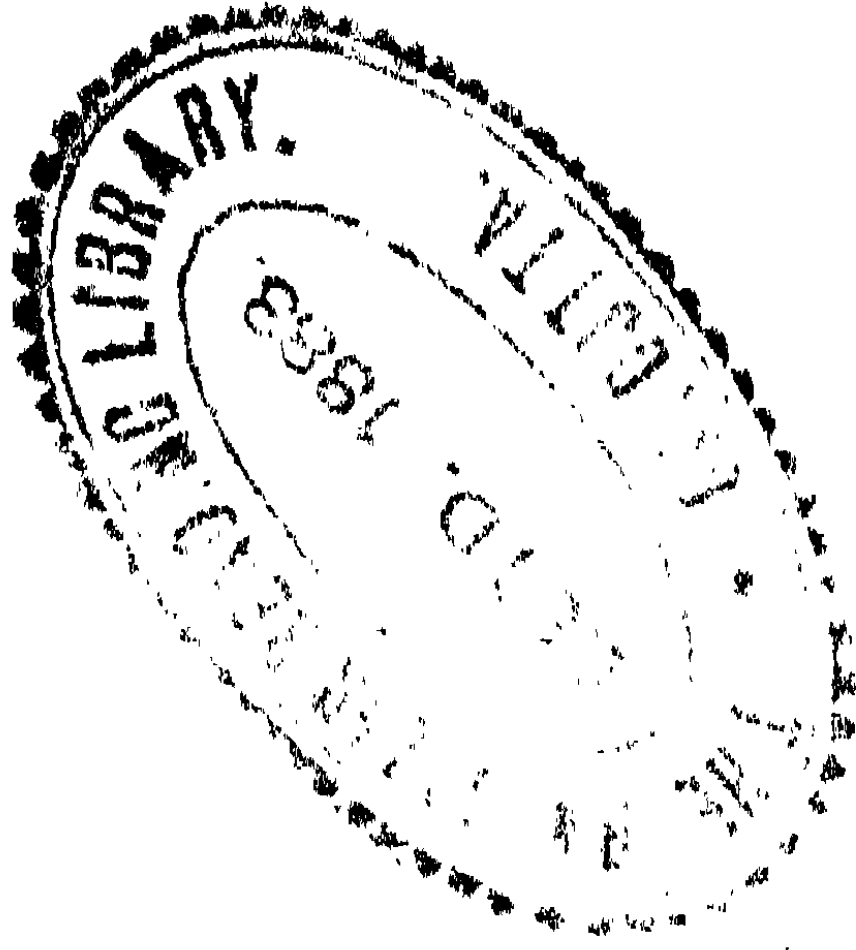
নিরাপৎস্থ।

ঐ যে লোকে বলে, "চোর পালা'লে বুদ্ধি বাড়ে,"—এটা কথার কথা নয়, সম্পূর্ণ সত্য। আর কথাটা যে কেবল চোর সম্বন্ধেই সত্য, তা নয় ; যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধেই এই কথাটী খাটে। অতীত ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া আমরা কত সময়েই কত প্রকার জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকি। 'ঐরূপ না করিয়া এইরূপ করিলে ভাল হইত', 'সে এই কথা বলিলে এই এই প্রকার উত্তর দিতাম', 'অমুক ব্যক্তি অমুক কাজ করিলে অমুকের ক্ষতি হইত'—এবম্বিধ-অনন্ত-প্রকারের-কল্পনা-জাল-জড়িত হইয়া কত অনাবশ্যক মৃত ঘটনা আমাদিগের মনোরাজ্যে চারিযুগের অমর হইয়া বাস করিয়া থাকে। কেবল যে অতীত কর্ম্মই মানস-স্বর্গের অমর দেবতা, তা নয় ; কত ভবিষ্যৎ আশা, অনুমান ও কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া কত সময়েই আমরা সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা ও উন্নতি-অবনতির কত নভস্পর্শী প্রাসাদ গড়ি এবং ভাঙ্গি। নিদ্রা-কালে যত স্বপ্ন দেখা যায়, তদপেক্ষা অনেক অধিক স্বপ্ন জাগরণ-কালে ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মার ন্যায় আমাদের মনও প্রতি মুহূর্ত্তে

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছে।

মনোনাশ

সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য,—এই সৃষ্টি বন্ধ করা। ব্রহ্মার পূজা করিতে হইবে না,—তাঁহাকে পেন্‌সন্ দিয়া বিদায় করিতে হইবে। বাহিরের জগৎ আছে থাক্; দেখিতে হইবে, যেন ভিতরে সংসারারণ্য না জন্মায়।

এজন্য, প্রথমতঃ সঙ্কল্প করা চাই। "আমার মন কোনও দিকেই যাইতে পারিবে না; আমি কোনও বিষয়েরই চিন্তা করিব না"—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করা চাই। সর্ব্বদা জ্ঞান-খড়্গ হাতে লইয়া সতর্ক থাকা চাই। মনে যখনই যে চিন্তা উঠিবে, তখনই সেটিকে ধ্বংস করিতে হইবে। এইরূপে মন-রাবণের 'এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি'কে নিধন করা চাই।

অনেক সময়ে অনেক চিন্তা আমাদের অলক্ষিতে, মহিরাবণ ও ডিম্বকাদির মত, আমাদিগকে ভগবৎ-সমীপ হইতে দূর দূরান্তরে লইয়া যায়। কত দূর যাইয়া টের পাই। টের পাওয়া মাত্রই, বলরামের মত, দৈত্য-দলন করিতে হইবে।

এই ভাবে কিছু কাল যুদ্ধ চালাইতে পারিলে,—রাবণের পুত্র পৌত্রাদির বিনাশ হইলে, রাবণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। "রাবণের মৃত্যু-বাণ রাবণেরই ঘরে"; মন তখন নিজেই নিজকে মারিয়া ফেলিবে।

অতি সাবধানে সংগ্রাম করিতে হয়। কোন চিন্তাকেই

উপেক্ষা করিতে হইবে না। কোন শত্রুকেই কৃপা করিলে চলিবেনা। শত্রুর শেষ রাখা নিরাপদ নহে। প্রত্যেক চিন্তাই রক্তবীজ,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। কেবল সংহার, কেবল সংহার। এইরূপ অনবরত সংহারের ফলে যখন মনোরাজ্য শ্মশানে পরিণত হইবে, তখনই তথায় শ্মশান-রঙ্গিনী আনন্দময়ীর আবির্ভাব হইবে।

যুদ্ধে কম্পিত-কলেবর হইবার কোনই কারণ নাই। পার্থ-সারথী সমুদয় ভ্রান্তি দূর করিবেন, বর্ম্মের মত আবরণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিবেন এবং, শক্তির অল্পতা দেখিলে, নিজেই রথ-চক্র হস্তে লইয়া শত্রু-বিনাশে অগ্রসর হইবেন। তাঁহারই নাম করিতে করিতে, কালীয়-দমন-কারীর মত, মনের মস্তকে নৃত্য করিতে হইবে। দমন তিনিই করিয়া দিবেন। "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্!"

চিন্তা-বর্জ্জনের জন্য, মনকে প্রশান্ত করিবার জন্য, বিষয়ের দোষ-দর্শন এবং ধর্ম্ম-লাভের উপকারিতা-চিন্তন ত করিবেই; তৎসঙ্গে যথাসম্ভব দৃশ্য-মার্জ্জনের চেষ্টাও করিতে-হইবে। যা না করিলে চলে, তা করিবে না; যা না বলিলে চলে, তা বলিবে না; যা না ভাবিলে চলে, তা ভাবিবে না। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।"

কোন বিষয়ের চিন্তা, কোনও প্রকারের সংকল্প-বিকল্প, কোনও রকমের বাসনা-কামনা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য

সর্ব্বদা হুঁসিয়ার থাকিতে হইবে। কিন্তু, কেবল ইহাতেই কাজ চলিবে না; সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণও আবশ্যক। সর্ব্বদাই ভগবানে মন রাখিবার চেষ্টা করিবে। যখনই মন অন্য দিকে যায়, তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া ভগবানে লাগাইতে হইবে। "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।" গীতায় আছে :—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ॥"

প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক বার বা দুই বার বা তিন বার কোন নির্দ্দিষ্ট আসনে সম-কায়-শিরোগ্রীব হইয়া বসিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ধ্যানাদি করিবে। অন্যান্য সময়ে, যেমন ভাবে হয়, চিন্তা—স্মরণ-মনন করিলে চলিবে।

স্নানাহার প্রভৃতি অবশ্য-করণীয় কর্ম্মগুলি কোন-না-কোন প্রকারে ভগবানের সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া ভাল; নতুবা, সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মরণ সুসাধ্য হয় না।

যোগবাশিষ্ঠ বলেন, 'আত্মজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয়—এই তিনটিই একই সময়ে অভ্যাস করিতে হয়।'

যাহা সাধনের কোনরূপ সহায়তা করে না, সেরূপ কর্ম্ম ও চিন্তা সম্পূর্ণরূপেই বর্জ্জনীয়।

যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রত্যহই গীতাখানা পড়িও। কেবল পাতা উল্‌টাইয়া গেলে চলিবে না। ৭।৮টির অধিক শ্লোক পড়িবার দরকার নাই। পড়িয়া,

ঐ শ্লোক কয়েকটির সম্বন্ধে আধ-ঘণ্টা বা তিন-কোয়ার্টার কাল চিন্তা করিতে থাকিবে। টীকা অনুযায়ী চিন্তা করিতে বলিতেছি না। তোমার মনই টীকা হইবে।

ভাল লাগিলে বিষ্ণুপুরাণ, যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ ও কোন কোন উপনিষৎ পড়িতে পার।

স্বর্গাশ্রম;

৫।২।'১৪ * * *

ওঁ

নিরাপৎস্থ।

লছ্‌মন্‌-ঝোলার নিকটে সময়ে সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শুক-পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। শুক-পক্ষীর বুদ্ধি-চাতুর্য্যের অনেক কাহিনী পুস্তকে পড়িয়াছি, লোক-মুখেও শুনিয়াছি। মনে হয়, বিনা কারণে সে এই প্রশংসার অধিকারী হয় নাই। ব্যোম-বিহারী, মুক্ত-স্বভাব একটী শুককে ধৃত করিয়া সুনির্ম্মিত লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর, তোমার হৃদয়ের সমুদয় স্নেহ-ও-প্রীতিদ্বারা তাহার উধাও মনকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হও, সুবর্ণ-পাত্রে রুচিকর পান-ভোজনাদি প্রদানে তাহার চিত্ত-ভ্রান্তি জন্মাইতে চেষ্টা কর;—সকলই বিফল হইবে। সে তাহার মুখের (মুখ বুদ্ধির স্থান) সাহায্যে শৃঙ্খল কর্ত্তন করিয়া লুপ্ত স্বাধীনতার উদ্ধার সাধন করিবে। আমাদিগের আদর্শ পূর্ব্বপুরুষ—মহীয়ান আদি-মানব—সনকাদি ব্রহ্মার-প্রথমজাত-পুত্র-চতুষ্টয়ও জন্মদাতার সমুদয় প্রয়াস বিফল করিয়া, দেহ-পিঞ্জর হইতে চিরমুক্তির নিমিত্ত গহন বনের অতিথি হইয়াছিলেন। বিশ্ব-শিল্পির প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইল! কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। শুক-পক্ষীর জন্য অহিফেনের

শুক-পক্ষী

আবিষ্কার হইল,—'মোহন'বাঁশী প্রস্তুত হইল,—ইন্দ্রিয়-দ্বার-গুলি বহির্দ্দিকে উদ্‌ঘাটিত হইল। মানব মোহ-মদিরা পান করিল,—'মোহন' বাঁশীর 'মোহিনী'তে ভ্রান্ত হইয়া তাহার মন-যমুনা উজান বহিল;—নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠধাম ভুলিয়া যাইয়া সুখের লোভে বিষয়ের দিকে ধাবমান হইল! কিন্তু ফল হইল কি? সুখ কি মিলিল? কেমন করিয়া মিলিবে? সুখকে পরিত্যাগ করিয়া, সুখ ভাবিয়া দুঃখের পেছনে চলিলে, কেমন করিয়া সুখ মিলিবে? তাই, সুখের অন্বেষণ আর শেষ হইতেছে না। অনবরত ছুটা-ছুটি চলিয়াছে, কিন্তু এ সুদীর্ঘ পন্থার অন্ত হইতেছে না। মাঝে মাঝে যখন পায়ে বেদনা হয়, পথ-শ্রান্তিতে দুর্ব্বল পথিক হয়রান্ হয়, তখন পথি-পার্শ্বে ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া একটু আরাম লাভ করে মাত্র। কিন্তু তাহা আরাম মাত্র—দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তি মাত্র;—সুখ নহে। আর সে আরামই বা কতক্ষণ? কয়েক মিনিট পরেই যে আবার গমন-ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে! তাই, এ আরামে লাভ নাই। এ বিশ্রাম যে পদ-যুগলকে আরও অবসন্নই করিয়া দেয়! যত দিন গমনের পরিসমাপ্তি না হইবে, যত দিন বিষয়-কাননে ভ্রমণ চলিতে থাকিবে, তত দিন ঐরাবত-পৃষ্ঠে অমরাবতীর নন্দন-কাননেই বিহার কর আর দণ্ড-কমণ্ডলু-হস্তে উত্তরাখণ্ডেই বিচরণ কর, সুখ—অপরি-চ্ছিন্ন নিত্য-সুখ মিলিবে না।

বেদ-বাণী

ভবের হাটে আসিয়া সকলেই সুখ কিনিতে ব্যস্ত। সুখের স্বরূপ কি, কত মূল্যে কোথায় পাওয়া যায়, তাহা জানে না; কেবল রব্—সুখ চাই, সুখ চাই। মানব প্রথমতঃ বাল্যকালে নানা ভাবের, নানা সাজের, রং-বেরংএর পুতুল পাইয়াই সুখী হয়; তখন মনে করে, 'আমি সুখী'। কিন্তু কিছু কাল পরে, কৈশোরে আর পুতুলকে সুখের উপকরণ মনে করে না। তখন পরীক্ষায় উচ্চস্থান ও সুদৃশ্য পরিচ্ছদাদিই সুখময় বলিয়া ধারণা জন্মে। কিন্তু সে-ই বা কত দিন? যৌবনাগমে বিবাহিত জীবনে সে বোধ করে, 'পূর্ব্বে কত বিষয়তেই সুখ মনে করিয়া সে ভ্রান্ত হইয়াছে!' কিন্তু কাল-স্রোত সদাই প্রবহমান; প্রৌঢ়ে ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতিই সুখের নিদান বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপে দেখিতে পাই, কোন বিষয়ই ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রদান করিতেছে না! সুখ যদি বিষয়ে থাকিত, তবে আজ যাহাতে সুখী হই, কাল তাহাতে হই না কেন? আমি যাহা পাইলে উৎফুল্ল হই, তুমি তাহাতে প্রীত হইতেছ না কেন? শীত-কালে যে গরম কাপড় ব্যবহার করিয়া আরাম পাই, গ্রীষ্ম-কালে তাহা কষ্টদায়ক হইবে কেন? যে সম্পত্তি পাইলে আমি নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করি, তাহা থাকিতেও ধনী ব্যক্তি পুত্র-শোকে অধীর কেন? বাস্তবিক, চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিবে,—বিষয়ে সুখ নাই, থাকিতে পারে না। যে

বেদ-বাণী

'আবিল-মধু'কে* (গল্পটী মনে আছে ত?) সাংসারিক মানব সুখ বলিয়া মনে করে, তাহা **Positive** সুখ নহে;—**Negative,** দুঃখের সাময়িক-নিবৃত্তি-মাত্র; তাহা বেদনার ব্যারামের অহিফেন—ভ্রমণ-পথে ২।১ মিনিট বিশ্রাম মাত্র—এতদতিরিক্ত নহে।

---

* ঘোর এক দুর্য্যোগের সন্ধ্যায় দিগ্‌ভ্রান্ত এক পথিক শ্রান্ত-দেহে যখন নিবিড় এক জঙ্গলের মধ্য দিয়া আশ্রয়-আশায় চলিতেছিল, এক উন্মত্ত হস্তী আসিয়া তাহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। পথিক প্রাণ-ভয়ে উদ্ধ-শ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল। পড়িতে পড়িতে গর্ত্ত-মুখের লতাজালে পা আট্‌কাইয়া যাওয়ায় পথিক হেট-মুণ্ডে ঊর্দ্ধ-পদে ঝুলিতে লাগিল। গর্ত্তের নীচে ছিল এক ক্রূর সর্প, ফণা বিস্তার করিয়া সে পথিককে দংশন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল। হস্তী তো গর্ত্ত-মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। পথিক ভয়ে একেবারে নিঃশব্দ নিস্পন্দ হইয়া ঝুলিতে লাগিল। এমন সময়ে সমীপবর্ত্তী বৃক্ষের মৌচাকটী ভাঙ্গিয়া গেল; ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল দংশন-জ্বালায় বিহ্বল করিলেও পথিক একটুও নড়িতে সাহস করিল না। ওদিকে এক মূষিক আসিয়া গর্ত্ত-মুখের লতাগুলির মূল একটী একটী করিয়া কাটিতে লাগিল। এমন সময়ে এক ফোঁটা মধু ধূলা-বালিতে মিশিয়া আঠার মত গিয়া পথিকের ওষ্ঠে পড়িল। পথিক চাটিয়া মধুর আস্বাদ পাইতেই আর এক ফোঁটা গিয়া পড়িল। পথিক আসন্নতম মৃত্যুর মুখেও ঐ মধুর লোভে সব ভুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত আরামে সে ফোঁটা চাটিতে চাটিতে ভাবিতে লাগিল, আবার কখন এক ফোঁটা পড়িবে!

কুইনাইন খাইয়া মাঝে মাঝে একটু সুস্থবোধ কর,—নহিলে ম্যালেরিয়া লাগিয়াই আছে। আফিং খাইলেও বেদনার ব্যারাম একেবারে সারিয়া যায় না। দুঃখ জগতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়া আছে।

আর ঐ যে relief, দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি,—ইহাই কি সর্ব্বদা পাওয়া যায়? কত সময়ে দেখা যায় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্য লইয়া আসিতে আসিতে রাস্তায় আছাড় খাওয়াতে খাবার নষ্ট হইয়া গেল! সকল পরিশ্রম বিফল হইল! সুলতান মামুদ কত অর্থ লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু ভোগ করিতে পারিলেন না। ভাবী সুখের অমোঘ উপকরণ তাঁহার মৃত্যু-যন্ত্রণাকে বর্দ্ধিতই করিয়াছিল! যে দিকেই চাই, দুঃখ যেন বিশ্বগ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। আচ্ছা, এই দুঃখাসুরের কি নিধন হয় না? দুঃখের চির-নিবৃত্তি কি হয় না? কেন হইবে না? উত্তম চিকিৎসকের ন্যায়, রোগের কারণ অনুসন্ধান কর। দেখিবে—সুখের লোভে ভ্রমণ করিতেছ বলিয়াই পথ-শ্রান্তি-ক্লেশ; বুঝিবে—সুখের আশা করিতেছ বলিয়াই দুঃখ। তাই, সুখের আশা পরিত্যাগ কর;—দুঃখের চির-নিবৃত্তি হইবে। সুখের আশা করিলে সুখ পাইবে না; আশা বিসর্জ্জন করিলেই শান্তি, নিরাশী হইলেই নিত্যানন্দের অধিকার-প্রাপ্তি। তাই, দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে, পূর্ণানন্দ লাভ করিতে হইলে, যমুনার উজান-স্রোত ফিরাইয়া দিতে হইবে, স্বাভা-

ত্যাগেই শান্তি

বিকী গতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, সনকাদির অনুবর্ত্তন করিতে হইবে—আশা, বাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। নতুবা, ক্রন্দনে যাহার আরম্ভ, যন্ত্রণায় যাহার সমাপ্তি, চাঞ্চল্যই যাহার স্বভাব, এমন জীবনে দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য। তাই, ঋষিগণ বলিয়াছেন, ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়। আবার মজা এম্‌নি, ঠিক ঠিক ত্যাগ হইলে কিছুই ত্যাগ হয় না ;—সকলই যেন চক্রবৃদ্ধি-হারে-সুদসহ ঘরে ফিরিয়া আইসে। ত্যাগের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রেমানন্দ যখন জন্মে, তখন এই দুঃখময় জগৎ আবার সুধাময় হইয়া যায়। তখন প্রকৃতিরাণী যেন নূতন বেশ পরিধান করিয়া কত আনন্দ প্রদান করেন ; তখন প্রত্যেক দ্রব্যে—প্রেমময়ের অঙ্গাবরণের এক একটী বোতামে কত সৌন্দর্য্য, কত লাবণ্য প্রতিভাত হয় ; তখন প্রত্যেক পরমাণু যেন অনন্তত্ব লাভ করে ; তখন জড়জগৎ চৈতন্যময়, প্রেমময় হইয়া নীরব ভাষায় কত কথা বলিয়া থাকে ;—সে কথায় কত প্রেম, কত জ্ঞান, কত শান্তি !

স্বর্গাশ্রম ;

১৪।২।'১৪

ওঁ

নিরাপৎস্থ্।

পোষ্টাফিসের পিয়ন

আচ্ছা, বল দেখি, তোমাদের পোষ্টাফিসের "পিয়ন" হইতে হইলে কি বেদান্ত-পরীক্ষা পাশ করিতে হয়? তার আচরণ কিন্তু খাঁটি বৈদান্তিকেরই মত। তোমরা তাকে যে চিঠির তাড়াই দাও, তা লইয়াই সে ছুটিতে থাকে। "দক্ষিণ মহাসাগরের একটি দ্বীপে একটা কুকুরের দুইটা 'ল্যাজ' আছে", এই অত্যাবশ্যক সংবাদটী পড়িবার জন্য আমরা "বসুমতী"র সকল দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজি। কিন্তু, তার হাতে নানা প্রকারের কত চিঠি,—অথচ কোন সংবাদের দিকেই সে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাস্তা দিয়া, চিঠির তাড়া লইয়া, আপন মনে চলিয়া যায়।—কত লোককে হাসায়, কত লোককে কাঁদায়; কিন্তু, সে আত্ম-সংস্থ,—কোন হাসি-কান্নার সহিতই যোগ দেয় না; সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কেহ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে অচেতন হইল; কেহ বহুকাল পরে, শিব-পূজার ফলে পুত্রলাভ করিয়াছে জানিয়া উৎফুল্ল; কেহ পত্র পাইবার আশা বিফল হইল বলিয়া বিষণ্ণ; কেহ বা শত্রুর বিজয়-সংবাদে কাতর ও হিংসাযুক্ত! সকল প্রকারের ভাব-তরঙ্গ রাস্তার

উভয় পার্শ্বে পরিবেষণ করিতে করিতে সে চলিয়া যায়; কিন্তু কেহই তাহাকে শত্রু বা মিত্র মনে করে না, সে-ও কাহাকে আপন বা পর মনে করিয়া ভাল বা মন্দ সংবাদ দেয় না! আরও দেখ, তোমাদিগের অপেক্ষা যারা বড় বড় কর্ম্মচারী, তাদের ত কথাই নাই,—তোমরাই কি সকলকে সমান ভাবে দেখ? তোমরা বন্ধুর বাড়ী যাইতে প্রীত হও, সম-পদস্থ লোকের বাড়ী যাইতে পার, কিন্তু 'নীচ' জনের কাছে যাইতে চাও না। কিন্তু পিয়ন তার গবাক্ষ-মণ্ডিত, ধূলিকণাপূর্ণ জামা গায়ে দিয়া, ধনীর প্রাসাদে ও বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গালের নিকটে, মহাবিদ্বান ও মহামূর্খ উভয়ের নিকটে, সৎ ও অসৎ সকলের নিকটেই সমভাবে উপস্থিত হয়;—কিছুই দ্বিধাবোধ করে না। এ লোক যদি ৭৲ বেতন পায় বলিয়া বৈদান্তিক না হয়, তবে, যে ৩০০৲ টাকা মাহিয়ানা পাইয়া, লিখিবার কলম খারাপ হইলে কলমের তিন পুরুষ তুলিয়া গালি দিতে থাকে, সে কি অনেক কেতাব কণ্ঠস্থ করিয়াছে বলিয়াই বৈদান্তিক হইবে? আচ্ছা, আর এক দিক দিয়া দেখা যাউক্। তুমি ৪০৲ টাকা বেতনের চাকর, আর পিয়ন ৭৲ টাকার চাকর, এই ত তফাৎ। কিন্তু উভয়েই যদি একত্র হইয়া কোথায়ও যাও, আর উভয়কেই একরকমের আসনে বসিতে বলা হয়, তবে কি তুমি নিজকে অপমানিত মনে কর না? পিয়ন তোমা অপেক্ষা চরিত্রবান হইতে পারে;

—কিন্তু সে যে অল্প বেতনের চাকর! কাজেই যে ব্যক্তি উভয়কে সমান আসন দেয়, সে সংসারের হিসাবে নেহাৎ বে-আক্কেল। এই প্রকারের এক বে-আক্কেলের কথা একটু লিখি। সে—সূর্য্য। সমুদ্রের লোণা জল এবং নর্দ্দমার দুর্গন্ধ বদ্ধ-জল তোমার আমার নিকটে বিভিন্ন আসন পাইলেও, সূর্য্যের নিকটে এক আসনই পায়;—সকলেরই একই মেঘে স্থান। সেখানে কোন ভেদ নাই, কোন তফাৎ নাই। অভেদ-দর্শনই জ্ঞান, সমত্বই যোগ, এক ভাবে অথবা নিজের ভাবে সর্ব্বদা থাকাই গুণাতীত অবস্থা।

সমদর্শন

যে দেখে, "সকলই 'তিনি'ময়; অন্তরে বাহিরে তিনি; অন্তর-বাহিরও তিনি"; যে জানে, "তাঁর ভিতরেই সকল, প্রত্যেকের ভিতরেই তিনি এবং প্রত্যেক-টিও তিনি"; যে বোঝে, "তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই, সকলই তাঁর রূপ, সকলই তাঁর বিকাশ"; যে উপলব্ধি করে, "সকল শরীর, সকল অনু-পরমাণু তাঁর শক্তি-প্রকাশের, প্রেম-লীলার যন্ত্রমাত্র; তিনিই সকল শরীরে দেখেন, বলেন, শুনেন ও আস্বাদন করেন, তিনিই সকল মনে চিন্তা করেন, তিনিই সাপ হ'য়ে কাটেন ও ওঝা হ'য়ে ঝাড়েন"; যে মনে করে, "সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, উচ্চ-নীচ—এ সকলই সেই একেরই বিভিন্ন প্রকাশ"; সে আর ভাব-বিপর্য্যয় দ্বারা

মুগ্ধ ও প্রতারিত হইবে কেন? সে যে বদ্‌মায়েসের বদ্‌মাইসিতে ও সাধুর সাধনায় তুল্য ভাবেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাই তার কাছে হেয় ও উপাদেয়, নিন্দা ও প্রশংসা, উন্নতি ও অবনতি, ভাল ও মন্দ—এ সকলই বিভিন্নতা-শূন্য হইয়া যায়। সংসারের কর্ম্মের জন্য—অধ্যাত্ম-রামায়ণের রামের মত—সে নানা ভাবের অভিনয়ই করে; কিন্তু সে কোন ভাবই ভিতরে গ্রহণ করে না;—সে "আপ্‌নাতে আপ্‌নি" থাকে।

সাধনা দ্বারা এ ভাব দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। "সকলই তিনি; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, ভাব-জ্ঞান-কর্ম্ম এবং এ সকলের অতীত চৈতন্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ—এ সমুদয়ই তিনি"—এই প্রকার চিন্তা করিতে হয়। চিন্তার ফলে তামস ও রাজস ভাব দূরীভূত হয় ও সাত্ত্বিক সমতা আসে এবং তৎপর ভাবাতীত, গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। ইহাই সাধনার লক্ষ্য।

তাই, সকল সময়ে হুঁসিয়ার থাকিতে হয়, যেন কখনও কোন কর্ম্ম, কোন ভাব, কোন বস্তু আমাকে আন্দোলিত করিতে না পারে।

কর্ম্ম-ফল

আরও একটা কথা মনে রাখিতে হয়। প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল আছে। যখনই যে ভাব মনে আসে, যে কর্ম্মই কর,—তা সামান্য হউক্ বা মহৎ হউক্, অন্যে জানুক্ আর নাই জানুক্,—

তার ফল ভোগ করিতে হইবে। যেমন কর্ম্ম কর, যেমন চিন্তা কর, ফলও তেমনই হইবে। অন্যের দোষের নিমিত্তও যদি তাহার উপর বিরক্তি-ভাব মনে জাগে, তবে তৎফলে দুঃখ আসিবেই। যেমন ভাব, তেমন লাভ।

স্বর্গাশ্রম ;

৩০।১।'১৪ * * *

ওঁ
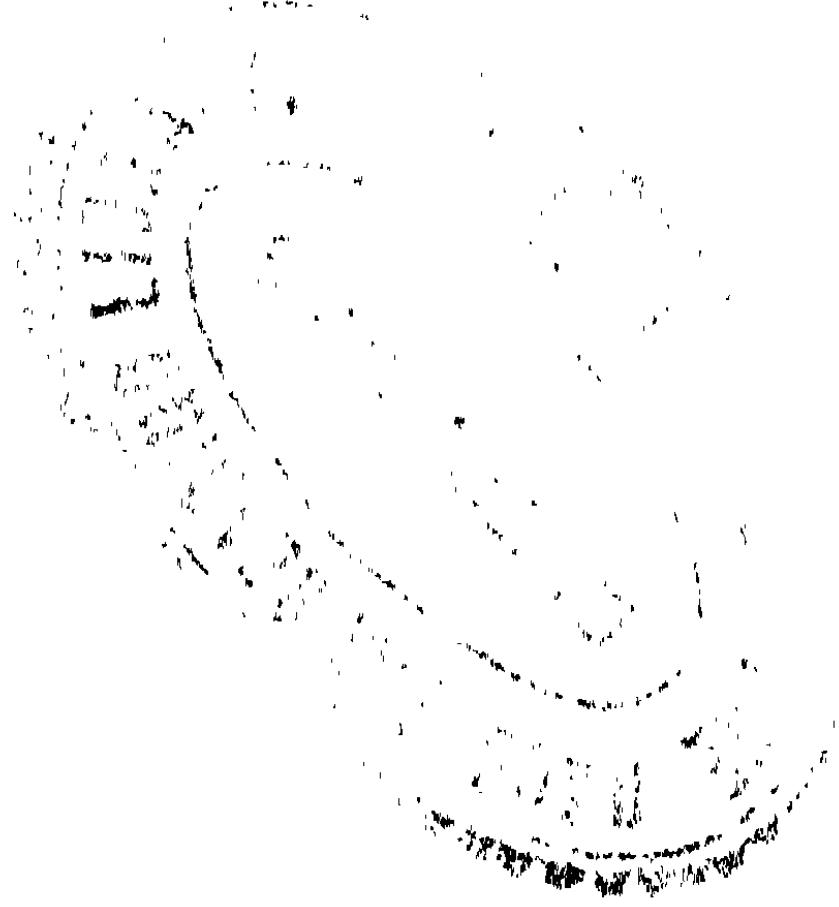
নিরাপৎস্থ।

একবার মহাবারুণী উপলক্ষে তিন সহোদর সমুদ্র-স্নান করিতে গিয়াছিল। দুপুর বেলা, একই সময়ে—এক শুভ মুহূর্ত্তে—তিন জনই জলে নামিল। কিন্তু ফল হইল কি? সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—চিনির পুতুল—আর ফিরিল না! শরীর পরিত্যাগ করিয়া—অনন্ত সমুদ্রে ক্ষুদ্র দেহ সমর্পন করিয়া অনন্ত কালের জন্য অনন্ত সাগরে মিশিয়া রহিল। মধ্যম—ন্যাকৃড়ার পুতুল—দেহ লইয়া—দেহের বহিরাকার লইয়া উঠিল বটে; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ জলময়, ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই জল। আর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ—উত্তপ্ত পাথরের পুতুলটী—যেমন ছিল, তেমনই রহিল;—তার ভিতরে এক বিন্দু জলও ঢোকে নাই; বাহিরে যা লাগিয়াছিল, তাও শীঘ্রই শুকাইয়া গেল।

তিন পুতুল

বিষয়-পরায়ণ সংসারী লোক এই প্রস্তরের পুতুল;—যতই তীর্থ-স্নান ও দেব-মূর্ত্তি-দর্শন, শাস্ত্র-পাঠ ও উপদেশ-শ্রবণ করুক্ না কেন, কিছুই তাদের ভিতরকে সহজে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না।

ভক্তি

কিন্তু, ভগবানের অনন্ত-করুণা-বলে যখন মানব ভক্তি-

ধনের অধিকারী হয়, তখন ভক্তির মাহাত্ম্যে, প্রস্তর বস্ত্রে পরিণত হয়, বস্ত্র চিনিতে পরিণত হয়, আর চিনি নিজের সমুদয় ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন করিয়া, সর্ব্বগত অনন্ত বিশ্বরূপ ধারণ করে। একমাত্র ভক্তিই এই অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম।

নারদ যখন মুক্তি-লাভের নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদা দৈববাণী ধ্বনিত হইল :—

" যদি অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র হরি বিরাজমান থাকেন, তবে আর তপস্যায় লাভ কি? যদি অন্তরে-বাহিরে কুত্রাপি হরি না থাকেন, তবেই বা তপস্যা করিয়া ফল কি? সুতরাং হে বৎস! ক্ষান্ত হও, তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া হরি-ভক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট হও। হরি-ভক্তির গুণেই অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের নিকটে যাইয়া ভক্তি শিক্ষা কর।"

গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন :—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"

যাঁহারা সৌভাগ্যবলে প্রেম-কণিকার অপূর্ব্ব আস্বাদ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—প্রেম কি অমূল্য বস্তু; তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—প্রেমের তুলনায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য বৃথা এবং অকিঞ্চিৎকর। তাই, যখন মহাভক্ত রায়দাসের সাংসারিক অর্থ-কৃচ্ছ্রতা দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে

একখানা স্পর্শমণি প্রদান করিলেন, তখন প্রেম-বিজড়িত কণ্ঠে রায়দাস বলিয়াছিলেন, "ভক্তগণের নিকটে প্রেমময়ের চরণ-কমলই অমূল্য নিধি। হৃদয়ের সুদৃঢ় দুর্গে আমি সেই অমূল্য নিধিকে সযত্নে রক্ষা করিতেছি;—দিবসের আলোকে কিম্বা রজনীর অন্ধকারে কখনই কেহ তাহাকে চুরি করিতে পারিবে না। সেই অতুল সম্পত্তি আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিতে সামান্য একখানা প্রস্তর লইতে যাইব কেন?" রায়দাস স্বচ্ছন্দ চিত্তে সাত-রাজার-ধন স্পর্শমণি প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ভক্তি-লাভের উপায়

এখন প্রশ্ন এই,—কেমন করিয়া ভক্তি লাভ করিব? পাষাণ-হৃদয়ে কেমন করিয়া প্রেম-গঙ্গা প্রবাহিত হইবে?

ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিষয় সম্বন্ধে যে নিয়ম, ভগবান সম্বন্ধেও সেই নিয়মই কার্য্যকারী হইবে। ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে ভগবানে আসক্তি জন্মিবে, আসক্তি হইতে তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মিবে। ব্যাকুলতা জন্মিলেই বৈরাগ্যের উদয় হইবে। তাহা হইতে ভগবানের সহিত নৈকট্য—প্রেম আসিবে। প্রেমের ফলে বিষয়-স্মৃতি দূর হইবে; এবং

সঙ্কল্প-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক ভাল-মন্দ প্রভৃতির বিচারও বন্ধ হইবে। তাহার ফলে অহঙ্কার—জীবত্ব ঘুচিয়া যাইবে।

তাই, দুর্ব্বল মনুষ্যগণের নিমিত্ত ভগবানের উপদেশ ঃ—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য-যুক্তস্য যোগিনঃ॥"

সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তা করিতে চেষ্টা করিলে তিনিই দয়া করিয়া সাধককে জ্ঞান-ভক্তির অধিকার প্রদান করেন।

আত্মত্যাগী, ধর্ম্মপরায়ণ শিবি রাজার উপাখ্যান জান ত? একদা শ্যেনরূপী দেবরাজ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কপোতরূপী অগ্নি ধর্ম্মনিষ্ঠ শিবির নিকটে উপস্থিত হইলেন। শিবি নিজের শরীর শ্যেনকে অর্পণ করিয়া সযত্নে কপোতকে রক্ষা করিলেন। এই আত্মোৎসর্গের ফলে শিবি-শরীর বিদীর্ণ করিয়া এক সুপ্রসিদ্ধ লাবণ্যময় তনয় জন্মগ্রহণ করিল।

যে জ্যোতির্ম্ময় মহীয়ান পুরুষের তেজে সকল প্রকাশিত ও তেজঃসম্পন্ন হয়, সেই স্বপ্রকাশ, সর্ব্বগত করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধাতা উপযুক্ত সময়ে জ্ঞান-ভক্তির শান্তিময় বিমল জ্যোতিকে ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধকের নিকটে প্রেরণ করেন। মধু-লুব্ধ সাধক তখন দেহ-মমতা বিসর্জ্জন করিয়া—তনু, মন, ধন সকলই সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-পদে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত হ'ন। তখন—আত্ম-সমর্পণ সম্যক্

অনুষ্ঠিত হইলে, সাধক নশ্বর দেহের বিনিময়ে বিজ্ঞানানন্দ—প্রেমানন্দ—নিত্যানন্দ নামক মনোমোহন পুত্র-রত্ন লাভ করিয়া ধন্য হ'ন।

কিন্তু একটা কথা আছে। কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি ত সম্পন্ন করিতেই হইবে। যখন হাতে কোন কাজ থাকিবে না, তখনই না হয় ভগবানকে চিন্তা করা চলে। যখন কর্ম্ম করিব, তখন ভগবচ্চিন্তা কিরূপে করিব ?

যদি তোমাদিগকে বলি, 'একটা বরফের পুতুল গঙ্গা-জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গা-জল দিয়া গঙ্গা-পূজা করিতেছে'; তাহা হইলে কি তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে ? কিন্তু, ভাবিয়া দেখ, আমরা প্রত্যেকেই কি ঐ প্রকারের এক একটি বরফের পুতুল নই ?

ভক্ত-কবি গাহিয়াছেন ঃ—

"সে কোন্ জোছনা দেশ সইরে ॥
যে দেশের অভিধানে, 'আমি' মানে 'তুমি'রে।
'তুমি' মানে 'আমি' বই অন্য কিছু নাইরে ॥
সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার চুপে।
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে ॥"

যদি এক অনন্ত ভগবান ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; যদি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি প্রত্যেক জীবে—প্রত্যেক পদার্থে বিরাজ করেন; যদি তিনিই সকল শরীরে 'আমি' 'আমি' করেন, এবং

প্রত্যেক শরীরে 'আমি' সাজিয়া নিজকেই নানাপ্রকারে 'তুমি' ও 'সে' বলিয়া থাকেন; যদি সমুদয় শক্তি—সমুদয় স্পন্দন—সমুদয় পরিবর্ত্তন—সমুদয় কর্ম্ম তিনিই এবং তাঁহারই অভিব্যক্তি, ইহা ঠিক্ হয়; যদি তিনি ভিন্ন অপর কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে; তবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন অসম্ভব হইবে কেন?

গীতায় পড়িয়াছ ঃ—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

সকল বিষয় তিনি, সকল কর্ম্ম তিনি, সকল ভাব তিনি—তিনি ভিন্ন যে কিছুই নাই—জগৎ তিনি, আবার জগৎ 'তিনি'ময়।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন ঃ—

"নগর ফের,—মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মাকে।
আহার কর,—মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মাকে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে॥"

এই প্রকার ধারণা করিতে করিতে বহুত্ব একত্বে পরিণত হয়, সমতা ও শান্তি হৃদয় অধিকার করে, শোক-মোহ চিরকালের জন্য পলায়ন করে।

একত্বই কি প্রেম নহে? যেখানে একত্ব, সেইখানেই ভালবাসা; যেখানে দ্বিত্ব, সেইখানেই বিরোধ। তাই, যখন

সাধন করিতে করিতে একত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখনই প্রেম-গঙ্গার আবির্ভাবে মন নিত্যানন্দে মগ্ন হইয়া যায়। তখন সাধক কোলাহল-মুখরিত নগরেই থাকুন, আর জন-মানব-শূন্য গিরি-কন্দরেই বাস করুন; কর্ম্মেই রত থাকুন আর সমাধি-স্থিতিই করুন; তিনি সর্ব্বদাই মনানন্দে ভগবানের পূজাই করিতেছেন। তাঁহার কাছে আর নবমী তিথি আসিতে পারে না—তাঁহার সন্ধি-পূজার শেষ হয় না।

তিনি যে কেবল নিজেই প্রেমময়ের পূজাপরায়ণ হন, তা নয়; তিনি দেখিতে পান,—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, প্রত্যেক অণু-পরমাণু প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানের পূজা করিতেছে। গঙ্গা-দেবী বরফে পরিণত হইয়া গঙ্গায় দাঁড়াইয়া গঙ্গা-জলে গঙ্গা-পূজা করিতেছেন! এ প্রেমপূজার—এ আনন্দলীলার বিরাম নাই—বুঝি আদি-অন্তও নাই!

স্বর্গাশ্রম;
২৫।২।'১৪

* * *

ওঁ

দুঃখের মত বন্ধু, দুঃখের মত সহায়, দুঃখের মত হিতকারী আর কে আছে? কল্যাণময় ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যখনই সে আমার নিকটে উপনীত হয়, তখনই যেন তাহাকে প্রীতির সহিত, আদরের সহিত সম্বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হই।

দুঃখের মত
কে আমাকে অনলস ও কর্ম্মপরায়ণ করে?
কে আমাকে নিপুণ ও শক্তিমান করিয়া তোলে?
কে আমাকে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী করিয়া দেয়?

দুঃখের মত
কে আমাকে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় প্রদান করে?
কে আমাকে শ্রদ্ধাবান, বীর্য্যবান ও উৎসাহসম্পন্ন করে?
কে আমার শক্তি-মন্দিরের গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়?

বেদ-বাণী

দুঃখের মত

কে আমার প্রহরীর কার্য্য করে ?

কে আমার ভ্রম সংশোধন করে ?

কে আমার ভ্রম নিবারণ করে ?

দুঃখের মত

কে আমাকে সংযত করে ?

কে আমাকে নির্ম্মল করে ?

কে আমাকে সৎপথে প্রেরণ করে ?

দুঃখের মত

কে আমাকে উদারতা ও সহানুভূতি শিক্ষা দেয় ?

কে আমাকে পরার্থে আত্মদানে প্রেরণা করে ?

কে আমাকে জীব-প্রেম, বিশ্ব-প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া ভগবৎপদারবিন্দে উপনীত করায় ?

দুঃখের মত

কে আমার অভিমানকে খর্ব্ব করে ?

কে আমাকে ভক্তিমান ও সমর্পিত-চিত্ত করে ?

কে আমাকে একাগ্র ও একনিষ্ঠ করিয়া দেয় ?

দুঃখের মত

কে আমাকে বিচারবান ও বৈরাগ্যবান করে ?

কে আমাকে আমার ও জগতের স্বরূপ-বোধ
জন্মাইয়া দেয় ?
কে আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগাইয়া দিয়া আমাকে
শান্তি-পথে পরিচালিত করে ?

দুঃখের মত
কে সুখ-প্রাপ্তির হেতু হয় ?
কে দুঃখ-বিনাশে সক্ষম ?
কে শান্তিদান করিতে সমর্থ ?

তাই,—যে কোন নামে, যে কোন রূপে, যে কোন বেশে, যে কোন অনুচরের সহিতই সে আমার সমীপস্থ হউক্ না কেন, সর্ব্বদাই যেন তাহাকে সন্তোষের সহিত, শান্তির সহিত গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

দুঃখই ধ্রুবকে নিত্য-পদ প্রদান করিয়াছে। দুঃখই প্রহ্লাদ-চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। দুঃখই যবন হরিদাসকে বরণীয় করিয়াছে।

নল এবং রাম, সীতা এবং সাবিত্রী, যুধিষ্ঠির এবং হরিশ্চন্দ্র,—দুঃখই ইহাঁদিগের মহত্ব ঘোষিত করিয়াছে।

দুঃখই সাধককে সিদ্ধ করে। দুঃখই তপস্বীকে ঋষি করে। দুঃখই আমাদিগের ভগবৎ-স্মৃতি বজায় রাখে।

বেদ-বাণী

কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন, "প্রভো! আমার দুঃখ-দুর্দ্দশার মেঘ কদাপি যেন অপসারিত করিও না।"

ভগবানের কৃপায় যে সুধা-সমুদ্রের অধিকার লাভ করিব, তাহার তুলনায় জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখরাশিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং গোষ্পদাপেক্ষাও নগণ্য। তবে,—ধর্ম্ম-লাভের জন্য, শান্তি-লাভের জন্য যে দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য, তাহা আমাকে নিরুৎসাহ ও পশ্চাৎপদ করিবে কেন?

প্রারব্ধ ত ভোগ করিতেই হইবে। যতটুকু দুঃখ ভোগ করিতেছি, ততটুকু প্রারব্ধ খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে; আর সেই পরিমাণে আমি শান্তির দিকে, আনন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তবে আর দুঃখাগমে আমি উৎফুল্ল হইব না কেন?

তিনিই যখন সকল সাজিয়াছেন, তিনিই যখন সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, তখন দুঃখের মধ্যেও কেন তাঁর প্রসন্ন বদন—কেন তাঁর বরাভয়দায়িনী মধুর মূর্ত্তি দেখিব না?

সকলই যখন তাঁহারই রূপ, তখন বিশ্ব-মূর্ত্তির সেবক আমি কেমন করিয়া দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিব?

যে প্রেমময়ের দর্শনাভিলাষে আমি দিন-যামিনী প্রতীক্ষা করিতেছি, তাঁহার অগ্রদূতস্বরূপ দুঃখরাশিকে কেন আমি সাদরে অভিনন্দিত করিব না?

যে মঙ্গলময়ের পাদমূলে আমি আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছি,

তাঁহারই প্রেরিত দুঃখাকার দর্শন করিয়া আমি বিষণ্ণ হইব কেন ?

অমৃত-সরোবরের দিকে পিপাসার্ত্ত আমি ব্যাকুল প্রাণে ছুটিয়াছি ;—দুঃখরূপ সামান্য ধূলিকণা কোথায় আমার চরণে সংযুক্ত হইল, তা ভাবিবার, দেখিবার অবসর আমার কোথায় ?

সুখময়ের সুখ-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রেমময়ের উপনেত্র চক্ষে ধারণ করিয়া যে বিশ্ব-মন্দিরে বিচরণ করিতেছে, তাহার নিকটে আর দুঃখের দুঃখত্ব কি ? সমুদয় দুঃখ-কষ্টই যে তাহার নিকটে সুখময়, মধুময় হইয়া যায়।

৺কাশীধাম।

ওঁ

অভ্যাস ও বৈরাগ্য

সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ব-বিধাতা—জ্ঞানময়, প্রেমময় এবং সর্ব্ব-শক্তিমান। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী মঙ্গলময় সর্ব্বদাই আমাদিগের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সর্ব্বদাই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে, মুক্তির পথে পরিচালিত করিতেছেন। যাহাকে শুভ বলিতেছি, যাহাকে অশুভ বলিতেছি,—আমরা বুঝি আর না বুঝি—সে সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। বুঝি আর না বুঝি, জানি আর না জানি, তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগের সমুদয় ভার বহন করিতেছেন, সর্ব্বদাই আমাদিগের প্রয়োজনানুরূপ সেবা করিতেছেন, সর্ব্বদাই আমাদিগকে তাঁহার আশ্রয়ে রাখিয়া রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া,—তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া,—দেহ-মনের সমুদয় ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়া,—নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া তাঁর শান্তিময়ী চিন্তায় কাল কর্ত্তন করিতে থাকিব।

১

এই পত্রখানির মধ্যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বিচার আছে; তাহার সকলগুলিই প্রত্যেকের জন্য নয়। বিভিন্ন প্রকৃতির সাধকের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বিচার গ্রহণীয়।

আমাদের যা'-কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদয়ের উৎকৃষ্টতম ব্যবস্থা যখন তিনিই করিতেছেন, তখন আর আমাদিগের অন্য কর্ম্মের আবশ্যক কি ? নিশি-দিন তাঁরই মহিমা স্মরণ করিব।

২

অভিমান-বশে যা করি, তাতেই বন্ধন-গ্রস্ত হই ; তবে আর আমি অভিমানকে, কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিব কেন ?

৩

ভগবানই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা। আমার আবার কর্ম্ম কি ? আমার আবার কর্ত্তব্য কি ? যদি কর্ত্তব্য কিছু থাকে, তাহা একমাত্র ভগবৎ-স্মরণ।

৪

সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ব-সম্রাট কি মরিয়া গিয়াছেন ? তিনি কি আমাকে বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছেন ? তিনি কি আমা অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান এবং কম সমর্থ ? জগতের প্রতি কি তিনি আমা অপেক্ষা কম প্রেমসম্পন্ন ?

তবে,—কেন আমি বিশ্ব-রাজ্যের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইব? কেন আমি অভিমান-বশে পাষণ্ড-দলনে বদ্ধ-কটি হইব? কেন আমি নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া জগতের শান্তিভঙ্গ করিব?

৫

আমার উপরে এবং অন্যের উপরে—সমগ্র জগতের উপরে সুখ-দুঃখের, ভাল-মন্দের ঘাত-প্রতিঘাত অবিরাম চলিতেছে। কে ইহাকে নিবারণ করিবে? কে ইহার গতিকে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত করিবে? বৃথাই আমার চাঞ্চল্য, বৃথাই আমার দাম্ভিক যত্ন। একটী সামান্য পিপীলিকা-দংশনে, একটী সামান্য ফোড়ার যন্ত্রণায় আমি কাতর হই; আমার আবার শক্তির অভিমান? যে সর্ব্বদা অপরের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত, যে সর্ব্বদা অপরের অনুগ্রহ-লাভের প্রয়াসী, সেই আমার আবার শক্তির অভিমান? যে নিজকে নিজে রক্ষা করিতে পারে না, যে ইচ্ছা করিলেই নিজের শরীর ও মনের মন্দটুকু দূর করিতে সমর্থ হয় না, যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, সেই আমার আবার কর্ত্তৃত্বাভি-মান? দূর হউক্ আমার দম্ভ, দূর হউক্ আমার অহঙ্কার, দূর হউক্ আমার অভিমান-প্রসূত কর্ম্ম সমুদয়। যাঁর

অঙ্গুলি-সঞ্চালনে অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা পরিচালিত হইতেছে, তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া তন্ময় হইয়া থাকিব।

৬

পাহাড় ছাড়িয়া বালির বাঁধের উপর দালান তুলিব কেন? ভগবানকে ছাড়িয়া জগতের উপর নির্ভর করিব কেন?

৭

মিছ্‌রি ফেলিয়া কে গুড় খাইবে? ভগবৎ-স্মরণ মুক্তি-প্রদ, বিষয়-স্মরণ বন্ধন-প্রদ। ভগবৎ-স্মরণ পরিত্যাগ করিয়া আমি বিষয়-স্মরণ করিব কেন?

৮

সমুদয় ভোগ্যবস্তু একত্রিত হইয়াও যখন আমাকে ব্রহ্মানন্দের সমান সুখ দান করিতে পারে না, বিষয়ারণ্যে ভ্রমণ বন্ধ না হইলে যখন ব্রহ্মানন্দ মিলিবে না, তখন ভগবচ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমি বিষয়-বাসনা করিব কেন?

৯

বেদ-বাণী

অতীতের অনন্ত জন্মে ত কত বিষয়-সেবাই করিয়াছি, কিন্তু তাহার ফলে ত জন্ম-বন্ধ ঘোচে নাই। তবে আর এ জন্মে বিষয়-সেবা-নিরত থাকিয়া শান্তি-নাথের সেবা পরিত্যাগ করিব কেন?

১০

আমার মন যখন একটি-মাত্র পদার্থকেও আশ্রয় দান করে, তখন দশ দিক হইতে পঞ্চাশটি পদার্থ মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আইসে। তবে আর আমি বিষয়-গত-চিত্ত হইয়া হৃদয় হইতে হৃদয়ের ধনকে তাড়াইয়া দিব কেন?

১১

অনিত্য বিষয়ে যার সন্তোষ, তার নিত্যানন্দে প্রয়োজন কি? নিত্যানন্দের প্রয়োজন-বোধ যাহার নাই, তার শান্তি লাভের সম্ভাবনাই বা কি? আমি ক্ষুদ্র বিষয়ে লুব্ধ হইয়া ভূমানন্দকে পরিত্যাগ করিব কেন?

১২

যেটুকু সুখ, যেটুকু শান্তি পাইতেছি, তাহা যাঁহার

নিকট হইতে পাইতেছি; দুঃখ-কষ্টময় সংসার-পথে যিনি আমার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন; যিনি সর্ব্বদা কোলে করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন; যিনি সর্ব্বদাই আমাকে শান্তির পথে পরিচালিত করিতেছেন; সত্য-লাভের পক্ষে যাঁহার কৃপাই আমার একমাত্র আশার স্থল; যাঁহার করুণা আমি কতবার উপলব্ধি করিয়াছি; যিনি আমার আপনার হইতেও আপনার; সেই অন্তর্য্যামী হৃদয়-দেবতাকে বিস্মৃত হইয়া আমি কোন্ প্রাণে বিষয়-পঙ্ককে হৃদয় দান করিব?

১৩

যাঁহার প্রসাদে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহার কৃপায় সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছি, তাঁহার-ইচ্ছায়-কিছু-সিদ্ধাই-ও-সাংসারিক-সুখ-সুবিধা লাভ করিয়া তাঁহাকেই ভুলিয়া থাকিব?

১৪

ভোগ যখন অশান্তি দূর করিতে পারে না, ত্যাগই যখন শান্তি-লাভের একমাত্র উপায়, তখন আমি ত্যাগী না হইয়া ভোগী হইব কেন?

১৫

যেমন কর্ম্ম, তেমনই মজুরি। তবে ভজন ছাড়িয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব কেন?

১৬

আমার অসৎ কর্ম্ম ও অসৎ চিন্তা যেমন আমাকে অবনত করে, তেমন জগৎকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে; তবে কেন আমি আত্ম-চিন্তা-পরাঙ্মুখ হইয়া বিষয়-বাসনায়, দেহ-বাসনায়, স্বার্থ-বাসনায় নিযুক্ত হইব?

১৭

ব্রহ্মত্বই আমার স্বরূপ, ব্রহ্মত্বেই আমার পূর্ণত্ব, ব্রহ্মেই আমার স্থিতি, ব্রহ্মেই আমার আমিত্ব, ব্রহ্মত্বেই আমার মুক্তি। তবে কেন আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পঞ্চভূতকে 'আমি' বলিয়া প্রতারিত হইব?

১৮

যে অন্তঃকরণ লাভ করিয়াছি, ভগবচ্চিন্তাতেই ইহার সার্থকতা। যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, ভগবানের সেবাতেই ইহার সার্থকতা। তবে কেন আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ না হইয়া

পশু-বৃত্তিতে মানব-জীবন কর্ত্তন করিব ?

১৯

মৃত্যু-কালের চিন্তা পরকালকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। কখন মৃত্যু আসিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। বিষয়-চিন্তার সহিতই আমাকে যদি সে গ্রাস করে, তবে ত ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়! তাই, বর্ত্তমান কালে কিছুতেই আমি ভগবানকে ভুলিতে পারিব না।

২০

এখন যদি বিষয়-চিন্তা করি, তবে সেই চিন্তার অভ্যাসে মৃত্যুকালে আমার মন বিষয়াকার ধারণ করিতেও ত পারে। তাই, বিষয়-চিন্তা সর্ব্বদাই বর্জ্জনীয়।

২১

পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারিলে অকুতোভয়ে, হাসিতে হাসিতে, আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব। তবে আমি কেন সর্ব্বদা 'শুদ্ধমপাপ-বিদ্ধম্' নিরঞ্জনে মনঃসমাধান করিব না ?

২২

একাই সংসারে আসিয়াছি, একাই সংসার হইতে বিদায় লইব। অন্যের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াই এই অশান্তির জাল প্রস্তুত করিতেছি। মোহ-জাল ছিন্ন হউক্ আসক্তির বন্ধন মোচন হউক্, আমি শান্ত-মনে আত্ম-চিন্তায় রত হই।

২৩

কেহ ভাল বা মন্দ, তাতে আমার কি আসে যায়? আমি কেন বৃথা সে চিন্তায় আত্মহারা হইব? আমি সর্ব্বদাই আত্ম-দেবের পূজায় নিযুক্ত থাকিব।

২৪

ভগবানই সকল সাজিয়াছেন, তিনিই সকল করিতে-ছেন। তবে আর সমালোচনা কেন? তবে আর মনের চাঞ্চল্য কেন? তবে আর অভিমান-প্রবাহ কেন? তবে আর মন সমরস থাকিবে না কেন?

২৫

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" এক তিনিই আছেন। তিনিই

সকল। সকলই তিনি। তবে আর জগৎ আমার সাধন-পথে কিরূপে দাঁড়াইবে? তবে আর আমার সর্ব্বদা ব্রহ্ম-স্মরণ কেন অসম্ভব হইবে? যখনই যে বিষয়ে মন যাইবে, তখনই তাহাকে ব্রহ্মময় মনে করিয়া মনকে ভগবন্ময় করিব।

২৬

তাঁর জগৎ লইয়া তিনি যেমন ইচ্ছা খেলুন। তা লইয়া আমি মাথা ঘামাইব কেন? আমি কেবল তাঁকে ডাকিব, তাঁকে ভাবিব, তাঁতে ডুবিয়া যাইব।

২৭

জগতের আবার গুরুত্ব কি? জাগতিক ব্যাপারের জন্য আমার অশান্তি উপস্থিত হইবে কেন? সর্ব্বত্র ভগবানের রসময় লীলা-বিলাস দর্শন করিয়া অনুদিন তাঁহাতে ডুবিয়া থাকিব।

২৮

যখনই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগে, যখনই চিন্তা-তরঙ্গ মনকে আলোড়িত করে, অমনি সে প্রবৃত্তির বেগ, সে তরঙ্গের

চাঞ্চল্য আত্ম-চিন্তা দ্বারা বন্ধ করিব না কেন ?

২৯

যদি কথনও বিষয়-ব্যবহার করিতেই হয়, বিষয়ের বিষয়ত্ব বর্জ্জন করিয়া, বিষয়ে ভগবদ্দর্শন করিয়া, বিষয়-ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ-পরায়ণ হইব।

৩০

বর্ত্তমানের সঙ্কল্প-কল্পনা, বর্ত্তমানের বিষয়-গ্রহণ কেবল যে বর্ত্তমান কালকেই নষ্ট করে, তা নয়; ভবিষ্যতের সাধন-ভজনেরও অন্তরায় হইবে। তাই, অন্তঃকরণকে, ইন্দ্রিয়-গুলিকে সর্ব্বপ্রযত্নে বশীভূত করিয়া, অন্তর্মুখ করিয়া সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যান করিব।

৩১

আমি ত "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" আমি ত কথনও কিছুই করি না। "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে।" কর্ম্মের সহিত আমার কি সম্পর্ক? যাহা হয় হউক্।

কর্ম্ম-চিন্তায় চঞ্চল হইয়া আমি ধর্ম্ম-চিন্তা পরিত্যাগ করিব কেন ?

৩২

অনন্ত শরীর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার মধ্যে মায়া-বশে স্পন্দিত হইতেছে। ইহাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? এগুলি আমার মধ্যে থাকিয়াও নাই। আমি নির্ব্বিকার পরমাত্মা।

৩৩

রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম, ব্রহ্মেও তেম্‌নি জগদ্‌ভ্রম হইতেছে। জগতের আবার সত্যতা কি? সত্য-ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা-ভাবনা করিব কেন ?

৩৪

আমি শরীর নই, আমি আত্মা। তবে আর আমি দেহ-বাসনায় অস্থির হইয়া আত্ম-চিন্তা বিসর্জ্জন দিব কেন ?

৩৫

যখন আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ থাকি, তখন আমি কি মহান্!
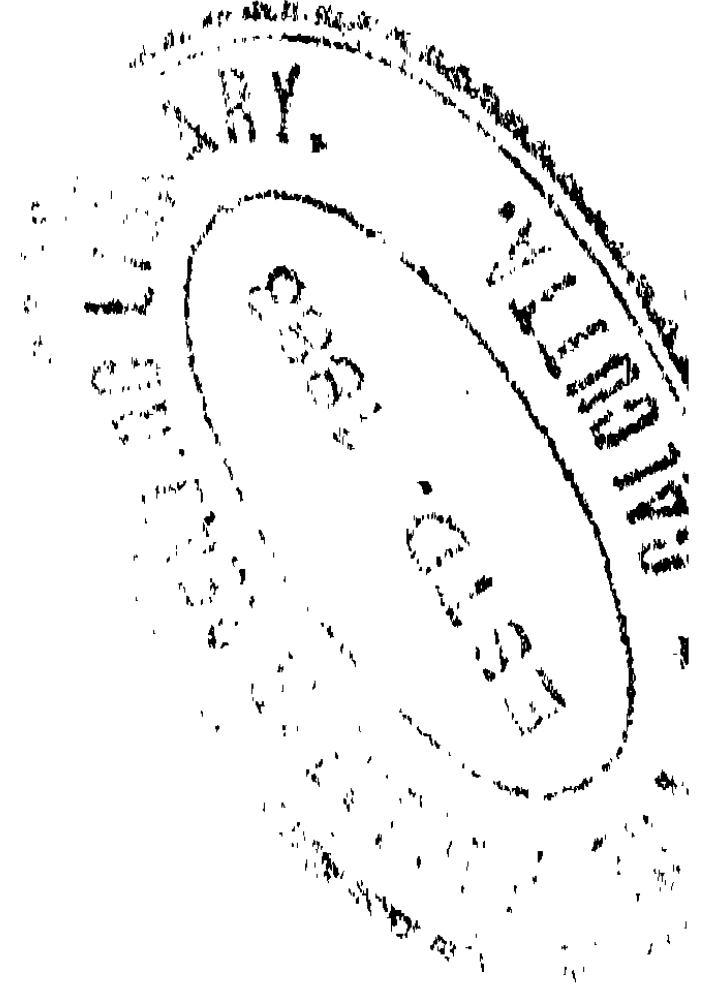
আর যখন বিষয়াসক্ত হই, তখন চৌদ্দ-পোয়া-পুটুলিতে-আবদ্ধ আমি কত ক্ষুদ্র, কত দুর্ব্বল, কত দুর্দ্দশাপন্ন! তবে আর আমি নিজকে নিজে ছোট করিব কেন? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারিব কেন? 'বড় আমি' না হইয়া 'ছোট আমি' হইব কেন? চৈতন্য-স্বরূপ না হইয়া বিষয়ের দাস হইব কেন?

৩৬

ব্যক্তি-বিশেষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই কি আমি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি? তবে আমি লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য ধর্ম্মনিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিব কেন?

৩৭

সংসারে যাহাদিগকে 'আপন' বলিয়া জানিতাম, তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে আমি প্রেমময়ের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছি, সেই আমি আবার কোন্ মুখে, কোন্ উদ্দেশ্যে, কোন্ বিবেচনায় দেহ-সুখের জন্য, যশ-মানের জন্য, লোক-রঞ্জনের জন্য নানা বিষয়ে মনোযোগী হইয়া লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইব?

৩৮

সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ সম্পাদনে ব্রতী হইয়া যে আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হইবার আশা করিতেছি, সেই আমি এক খণ্ড কৌপীনের অপহরণে চঞ্চল হইব কেন, প্রতিপত্তির ইচ্ছায় ব্যতিব্যস্ত থাকিব কেন, লাঞ্ছনার ভয়ে সশঙ্ক রহিব কেন, ক্ষণিক আরামের লোভে ছুটাছুটি করিব কেন, বন্ধু-বিয়োগে কাতর হইব কেন, সমুদয় জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া শান্ত মনে ভগবচ্চিন্তা করিতে পারিব না কেন ?

৩৯

দুঃখ, দৈন্য সংসারে অপরিহার্য্য। যত সহ্য করা যায়, ততই দুঃখের দুঃখত্ব কমিয়া যায়। যত অস্থির হইবে, ততই দুঃখের দুঃখরূপত্ব বাড়িবে। তবে আর আমি দুঃখ-চিন্তায় অধীর হইয়া নিত্য-চিন্তা বিসর্জ্জন করিব কেন ?

৪০

অমৃতত্ব-লাভই যখন আমাদিগের লক্ষ্য, ভগবদ্দর্শনই যখন মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার, শান্তি-লাভের চেষ্টাই যখন আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য এবং পরম পুরুষার্থ, তখন সামান্য দুঃখ, কষ্ট এবং অসুবিধার ভয়ে কেন

আমি ভগবচ্চিন্তা বর্জ্জন করিয়া ক্ষণিক সুখের চেষ্টায় নিযুক্ত হইব ?

৪১

কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম অপেক্ষা বড় ? কোন্ কর্ম্ম সাধন অপেক্ষা অগ্রে নিষ্পাদ্য ? তবে, এখনই আমার সম্মুখে সাধনের যে সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত, তাহার সদ্‌ব্যবহার না করিয়া বর্ত্তমান সময়ে আমি অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব কেন ?

৪২

বর্ত্তমানে সাধনের যে সুযোগ আছে, তাহা যে ভবিষ্যতে মিলিবে, তার নিশ্চয়তা কি ? তবে আর সাধন-ভজন ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া এখন বিষয়-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিব কেন ?

৪৩

শান্তি-লাভই যদি আমার জীবনের লক্ষ্য হয়, লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য যদি আমার ঐকান্তিক বাসনাই থাকে, তবে

আমি লক্ষ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সাধনার—সিদ্ধি-লাভের বিঘ্ন ঘটাইব কেন ?

৪৪

ধর্ম্ম-লাভ করিবার পূর্ব্বে অন্য কর্ম্মে আমার কি অধিকার, অন্য কর্ম্মে আমার কি প্রয়োজন ?

৪৫

এই মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম না করিয়া আমি অন্য কথা বলিব কেন ? এখন ভগবানের রূপ না দেখিয়া অন্য রূপ দেখিব কেন ? বর্ত্তমানে ভগবানের মাহাত্ম্য চিন্তা না করিয়া বিষয়-চিন্তা করিব কেন ?

৪৬

যখন অন্যের দোষের দিকে দৃষ্টি পড়ে তখন কেন আমি নিজের দোষ দর্শন করিব না, কেন আমি নিজে নির্দ্দোষ হইয়া ভগবানের সাক্ষাৎকার-লাভের অধিকারী হইব না ?

৪৭

কপটতা ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান অন্তরায়। তবে কেন আমি চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইব?

৪৮

কেন আমি শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব? কেন আমি শাস্ত্রালোকে—সাধনালোকে সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত না করিব? কেন আমি মিথ্যা জগতের মায়াময় পদার্থ-গুলিতে কৌতূহলসম্পন্ন হইব? কেন আমি ঋষি-মুনি-গণের উচ্চাদর্শের অনুকরণ না করিব? কেন আমি শ্রেষ্ঠতম পদবীতে আরোহণের চেষ্টা না করিব? কেন আমি রোগ ও শোকে, বাধা ও বিঘ্নে, ভয় ও সংশয়ে, আলস্য ও সাময়িক অকৃতকার্য্যতায় উদ্যমশূন্য হইয়া সিদ্ধি-লাভের পূর্ব্বেই সাধন-সমর পরিত্যাগ করিব? সেই আফলোদয়-কর্ম্মা টিট্টিভের * মত, অধ্যবসায় সহকারে, আমিও কেন সকল সময় যথাসাধ্য ধর্ম্ম-সাধনে অতিবাহিত

---

* এক টিট্টিভ-দম্পতি একবার বিদেশে যাইবার সময়ে তাহাদের ডিম-গুলি সমুদ্রের তীরে এক গর্ত্তে রাখিয়া গিয়াছিল। ডিমগুলি সমুদ্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, টিট্টিভীর এই আশঙ্কা বুঝিয়া টিট্টিভ সমুদ্রকে শুনাইয়াই বলিয়া গেল, সে তাহা হইলে সমুদ্র শোষণ করিবে নিশ্চয়। সমুদ্র কিন্তু কৌতূহলী হইয়া ডিমগুলি লুকাইয়া রাখিল। কিছু দিন

না করিব ? কেন আমি শ্রদ্ধা-হীন, বীর্য্য-হীন, ধৈর্য্য-হীন, উৎসাহ-হীন হইব ?

৪৯

সময় কম, কাজ অনেক। আমার কি অন্য দিকে মন দিবার অবসর আছে ?

৫০

স্বর্গাশ্রম ;
১৭।১১।'১৭

পরে ফিরিয়া আসিয়া টিট্টিভ ডিম না পাইয়া রাগে তার কথামত সমুদ্র শোষণ করিবার জন্য ঠোঁটে করিয়া এক এক বিন্দু জল লইয়া তীরে ফেলিতে লাগিল। টিট্টিভী শোকাচ্ছন্না হইলেও অবিলম্বে আসিয়া স্বামীর সহায়তা আরম্ভ করিল। কতক্ষণ পরে একঝাঁক চড়ুই পাখী আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া প্রথমে বিস্ময়ে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সব শুনিয়া জাত-ভাইদের প্রতি কর্ত্তব্য করিবার জন্য গম্ভীর ভাবে তাহাদের কাজে যোগ দিল। এই রকম করিয়া ছোট বড় অনেক পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া তাহাদের সাহায্যে লাগিয়া গেল। সকলের সমবেত-চেষ্টায়ও যে জল উঠিতেছিল, তা'তে সমুদ্রের ভারী আনন্দ হইতেছিল। এমন সময়ে বিহঙ্গমরাজ মহাবল গরুড় আকাশ-পথে যাইতে যাইতে এই ব্যাপার দেখিয়া নামিয়া আসিলেন এবং সমস্তটা শুনিয়া টিট্টিভের সত্যপ্রতিজ্ঞতা, আত্মশক্তির উপর শ্রদ্ধা এবং অধ্যবসায় দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া পক্ষী-জাতির অবমাননার সমুচিত সাজা দিবার জন্য সমুদ্র-শোষণ আরম্ভ করিলেন। সমুদ্র ভয়ে ডিমগুলি টিট্টিভকে ফিরাইয়া দিয়া ক্ষমা চাহিয়া তবে গরুড়কে নিরস্ত করিয়া আপনাকে বাঁচাইল।

ওঁ

স্বয়ঞ্জ্যোতি চিন্মণির দিব্য প্রকাশে যে সকল ভক্তিমানের হৃদয়-কন্দর উদ্ভাসিত হয়, তাঁহারা সমগ্র বিশ্বকেই এক 'নব রাগে রঞ্জিত' দর্শন করেন। নিরঞ্জনকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা নির্ম্মল হন; তাঁহাদিগের চক্ষে জগৎও নির্ম্মল হইয়া যায়। তাঁহাদিগের নিকটে পাপ নাই, দোষ নাই, বিদ্বেষ নাই। তাঁহাদের নিকটে সমুদয় জলই গাঙ্গ-বারি, সমুদয় স্থলই বৃন্দারণ্য, সমুদয় জীব-শরীরই দেব-বিগ্রহ এবং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই ভগবানের মন্দির। মহাত্মা অর্জ্জুনদাসের নাম শুনিয়াছ। আমরা যাহাকে ভাল বলি, আমরা যাহাকে মন্দ বলি, এমন সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহারও দৃষ্টি-পথে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্যে দোষ-গুণ দেখেন নাই। তিনি দেখিতেন—প্রত্যেক হৃদয়েই তাঁহার প্রিয়তম বিরাজমান রহিয়াছেন। তাই, যখনই কোন মানব-মূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-গোচর হইত, তখনই তিনি প্রেমার্দ্রহৃদয়ে তাহার সম্মুখে আরতি করিতেন। তিনি অনুভব করিতেন—এক অন্তর্য্যামী ভগবানই সকল শরীরে শরীরী, সকল দেহের কর্ত্তা এবং সকল ইন্দ্রিয়ের

বিজ্ঞানীর অবস্থা

নিয়ামক। এই সকল মহাপুরুষ কেবল যে জীব-শরীরেই ভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি করেন, তা নয়; তাঁহারা জড়ের মধ্যেও চৈতন্য-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। মহাত্মা-তুলসীদাস-বংশাবতংস স্বামী রামতীর্থজী লিখিতে লিখিতে হস্তস্থিত পেন্‌সিলটীর দিকে তাকাইয়া ভাবে বিভোর হইতেন এবং সেইটিকে বারম্বার চুম্বন করিতে থাকিতেন। এই যে অনন্ত কর্ম্ম-স্রোত, এই যে অনন্ত ভাব-প্রবাহ,—এ সকলকে তাঁহারা প্রেমময়ের লীলা-বিলাস বলিয়াই অবগত হন। কর্ম্মের মধ্যেও বিশ্বরূপকে পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, গাজীপুরের মহাত্মা পওহারী বাবা যেরূপ প্রেমের সহিত, যেরূপ মনোযোগের সহিত ভজন করিতেন, ঠিক্ তেমনই প্রেম, তেমনই মনোযোগের সহিত থালা-বাটীও পরিষ্কার করিতেন। এই বিজ্ঞানবান মুনিগণের প্রজ্ঞা-নেত্র সর্ব্বদাই সর্ব্বাধার অবিনাশী চৈতন্য-দেবের উপর ন্যস্ত-দৃষ্টি থাকে। তাঁহারা দেখিতে পান—ধীর, স্থির, শান্ত চিৎ-সমুদ্রের ভিতরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত পরমাণু-পুঞ্জ, অনন্ত শরীর, অনন্ত ভাব সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছে। তাঁহারা বোধ করেন যে ঐ নিত্য, সর্ব্বগত চিৎ-সমুদ্রই স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকিয়াও স্বীয় অনন্ত-শক্তি-বলে এই অনিত্য, অস্থির নাম-রূপাত্মক জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহারা জানেন যে বিশ্বকর্ম্মা ভগবানই সকল যন্ত্রের যন্ত্রী, সকল শরীরের কর্ত্তা

এবং সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা। তাঁহারা অনুভব করেন—তিনিই সকল শরীরে বক্তা, তিনিই সকল শরীরে শ্রোতা, তিনিই সকল শরীরে ভোক্তা এবং তিনিই সকল শরীরে জ্ঞাতা এবং দ্রষ্টা; একমাত্র তিনিই ছিলেন, একমাত্র তিনিই আছেন, একমাত্র তিনিই থাকিবেন; তিনি ভিন্ন অন্য কিছু কখনও ছিল না, তিনি ভিন্ন অন্য কিছু এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না; যা কিছু, সকলই তিনি, সকলই তাঁর, সকলই তাঁহাতে এবং তিনিই সকলে।

বিজ্ঞান সাধন-লভ্য

এই যে উপলব্ধি, এই যে অপরোক্ষানুভূতি, ইহা মহাপুরুষগণ জন্মকালেই প্রাপ্ত হন না। তাঁহারাও তোমার আমার মতই থাকিয়া সাধন-সহায়ে পরিশেষে জ্ঞান-প্রেমের উচ্চতম পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন, "আমিও তোমাদেরই মত ছিলাম। আমারও কত দুর্ব্বলতা ছিল। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছি। এখন এমন অবস্থায় আছি যে পূর্ব্বের দুর্ব্বলতাগুলি কেমন করিয়া আমার মধ্যে ছিল, তা ভাবিতেও এখন বিস্ময় হয়। সাধন-বলেই আমি এরূপ হইতে পারিয়াছি; সাধন বলে তোমরাও এইরূপ হইতে পারিবে।" উৎসাহের সহিত সাধন করিতে হইবে, সিদ্ধি লাভ পর্য্যন্ত সাধনে লাগিয়া থাকিতে হইবে। উপরোক্ত ভাগ্যবানদিগের হৃদয়-পঙ্কজ প্রেম-প্রবাহের মধুময় প্লাবনে

সাধন নিরবচ্ছিন্ন হওয়া চাই

যেমন ভাবে অভিষিক্ত হইয়াছিল, আমাদিগের হৃদয়কেও যদি তেমন ভাবে প্রেম-রসে আপ্লুত করিতে চাই, তবে উহাঁদিগের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত সত্য-স্বরূপকে দিবানিশি অনুধ্যান করিতে হইবে। তাঁহাকে ভাবিতে হইবে, তাঁহাতে ডুবিতে হইবে, তাঁহার মধ্যে নিজকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে। কুক্কুর যখন রুটি লইয়া পলায়ন করিতেছিল, তখনও বামদেবের * সর্ব্বত্র-ব্রহ্ম-দৃষ্টি অব্যাহত ছিল বলিয়াই সে দিন তাঁহার জীবন চিরকালের তরে ধন্য হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, যে দিন রামদাস † মহিষ-মূর্ত্তিতে

---

* দিনমান তপস্যায় যাপন করিয়া সন্ধ্যায় বামদেব ভগবানকে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন। এক সন্ধ্যায় ভোগের জন্য রুটিতে ঘী মাখিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা কদাকার কুকুর আসিয়া একখানা রুটি লইয়া পলাইয়া গেল। রুটিখানাতে ঘী মাখান হইয়াছিল না; বামদেব ঘী'র ভাঁড় হাতে করিয়া কুকুরের পিছন পিছন দৌড়াইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন "ওরে! দাঁড়া, ঘীটা মাখিয়ে দেই।" কিছুদূর গিয়া আর কুকুর দেখা গেল না। বামদেবের সম্মুখে প্রসন্নমূর্ত্তি তাঁহার উপাস্য দেবতা, স্মিতমুখের একপ্রান্তে রুটিখানা রহিয়াছে। দেবতা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বামদেব! তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে, তুমি সর্ব্বভূতেই আমাকে তুল্যরূপে ভালবাসিতে শিখিয়াছ।"

† একদা সাধু রামদাস আপন আশ্রমের নিকটেই মহাত্মা তুলসীদাসের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন, "মহারাজ! আমাকে কৃপা করিয়া ভগবানকে দেখাইতে হইবে।" তুলসীদাস কহিলেন "আচ্ছা কাল দুপুরে ভগবান তোমার আশ্রমে যাবেন।" রামদাস

ভগবদ্দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, সেই দিন সমীপাগতা কৃপাময়ী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভে বঞ্চিত হইয়া কি পরিতাপেই না দগ্ধ হইয়াছিলেন! তাই বলিতেছি, যদি জীবনকে কৃতার্থ করিবারই বাসনা থাকে, তবে একটু সময়ও নষ্ট করিতে হইবে না। সর্ব্বদাই ভগবচ্চিন্তা করিতে হইবে, সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রকারে ভগবানে মন লাগাইয়া রাখিতে হইবে।

সাধন

যদি কখনও ভাগ্যবলে কোন তত্ত্বদর্শী প্রেমিকের সঙ্গ-লাভ করিতে পার, তাঁহার সেবা কর এবং তাঁহার নিকট হইতে ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। উঁহার চরণোপান্তে

আশ্রমে আসিয়া কতরকম করিয়া আশ্রম সাজাইলেন এবং ভগবানের প্রসাদ পাইবার জন্য সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়া বিবিধ ভোগ সম্ভার প্রস্তুত করিলেন। এদিকে তো পরদিন দুপুর প্রায় অতীত হইয়া গেল, ভগবান আর আসিতেছেন না! রামদাস উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘর-বাহির করিতেছেন, এমন সময়ে চীৎকার উঠিল, এক মহিষ আসিয়া সব খাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেছে। রামদাস তাড়াতাড়ি এক লাঠি দ্বারা মহিষকে উত্তমরূপে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, এবং সন্ধ্যার সময়ে ক্ষুব্ধ-চিত্তে আসিয়া তুলসীদাসকে তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া নিন্দা করিলে, তুলসীদাস কহিলেন, "ভগবান আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তিনি দুপুরেই তোমার আশ্রমে গিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাঁহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ।" রামদাস কাঁদিতে লাগিলেন, "ভগবান কতরূপেই কতসময়ে অভাগাদের কাছে আসিয়া থাক! হায়! অন্ধ আমরা তোমায় চিনিতে পারি না।"

উপবিষ্ট হইয়া উপনিষৎ, গীতা, বিষ্ণু-ভাগবৎ, দেবী-ভাগবৎ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। অথবা, তাহা সম্ভব না হইলে, ঐ পুস্তকগুলি নিজে নিজেই বুঝিবার চেষ্টা কর। নির্জ্জনে সমাসীন হইয়া ভগবত্তত্ত্ব চিন্তা কর এবং সৃষ্টি-কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা বিধাতার অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত মহিমার ধারণা করিতে যত্নবান হও। শ্রবণ ও বিচারাদির সাহায্যে তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের অনুভব করিতে সচেষ্ট হও। তাঁহার মহিমাব্যঞ্জক স্তোত্র এবং সঙ্গীত গান এবং শ্রবণ কর। তাঁহার নিকটে প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা কর। যখন কোন মন্দিরে গমন কর, তখন চিন্তা কর—'তিনিই পূজ্য দেব-মূর্ত্তি সাজিয়াছেন, তিনিই পূজক হইয়াছেন, তিনিই পূজা এবং তিনিই পূজার উপকরণ।' প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে মনে কর—'নিরাধার অনন্ত-দেবের আবার পরিক্রমণ কি? তবে তিনিই তাঁহার কতকগুলি শরীরে তাঁহার এই বিগ্রহ শরীরকে প্রদক্ষিণ করিয়া লীলা করিতেছেন। অথবা, সর্ব্বাধার হইলেও তিনি প্রত্যেক স্থানেই পূর্ণরূপে বিরাজমান; তাই, এই মন্দির-প্রদক্ষিণে বিশ্বাধারকেই প্রদক্ষিণ করা হইতেছে।' সংকীর্ত্তন শুনিয়া মনে কর—'তিনিই এই সকল শরীরে নিজের মহিমা নিজেই কীর্ত্তন করিয়া কি অপরূপ নাট্যেরই না অভিনয় করিতেছেন! তিনিই সাপ সাজিয়া দংশনা করেন, ওঝা সাজিয়া চিকিৎসা করেন, রোগী

সাজিয়া দুঃখ ভোগ করেন।' প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত আসনে যথানিয়মে উপবিষ্ট হইয়া অখণ্ড, অদ্বৈত সচ্চিদানন্দের ধ্যান কর। ধ্যান-কালে অথবা অন্য সময়ে প্রণব-মন্ত্র জপ কর। প্রণবের অর্থ এবং মাহাত্ম্য চিন্তা কর। মেঘের গর্জ্জনে, বিহঙ্গের কলরবে, রোগীর আর্ত্তনাদে প্রণব-ধ্বনিই শ্রবণ কর। নিস্তব্ধ নিশীথে শুনিতে থাক—অনাহত ধ্বনির প্রবাহ-তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত হইতেছে। আর, সম্ভব হইলে, অনুভব কর—তোমার ভিতরেও অনাহত-ধ্বনির অচ্ছিন্ন প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা-কালে নানকের* মত চিন্তা কর—'ভগবান প্রকৃতি সাজিয়া কেমন সুন্দর ভাবে নিজের আরতি করিতেছেন!' আকাশে পক্ষী ও পুকুরে মাছ দেখিয়া চিন্তা কর—'সকল শরীরই চিদাকাশের উড্ডয়নশীল পক্ষী এবং চিৎ-সমুদ্রের সন্তরণশীল মৎস্য।' রেলগাড়ীতে চড়িয়া মনে কর—'ড্রাইভার যেমন গাড়ীগুলিকে আপন ইচ্ছায় চালাইতেছে, অন্তর্য্যামী

---

* গুরু নানক শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া এক সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের আরতি দেখিতে যখন মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, গুরুজীর দীর্ঘশ্মশ্রু দর্শনে পাণ্ডাগণ তাঁহাকে মুসলমান মনে করিয়া বাধা দিল। সঙ্গের শিষ্যবর্গকে ব্যথিত বুঝিয়া নানক নিঃশব্দে সমুদ্র-তীরে আসিলেন এবং ভগবানের অখণ্ড বিরাট আরতি—গগনের থালায় চন্দ্র সূর্য্য দীপ-যুগল আর তারার মাল্য লইয়া, পবন চামর ও অনাহত শব্দের বাজন্ত ভেরী দ্বারা পূজারাণী প্রকৃতি যে মহান্ সুন্দর—গম্ভীর আরতি করিতে-

ভগবানও তেমনই তাঁহার ইচ্ছামত সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।' তোমার ইচ্ছা ও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই যে তোমার শরীরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—সকল কালেই অনবরত প্রাণ-ক্রিয়া চলিতেছে, তাহা উপলব্ধি কর এবং তাহার মূলে ভগবৎ-শক্তি দর্শন কর। ঐ যে বালকটী একটী কাচের গেলাস হস্তে লইয়া যাইতেছে, ঐ চলন্ত গেলাসটির ভিতরে বাহিরে রোদ্ থাকিলেও রোদ্ যেমন কখনও চলে না, তেমনই পরমাত্মা এই সকল চলনশীল শরীরের ভিতরে বাহিরে সমভাবে থাকিয়াও সর্ব্বদা ধীর, স্থির, শান্ত, নির্ব্বিকার। মনে কোন ভাব-তরঙ্গ উঠিলে মনে কর—'উহা চিৎ-সাগরেরই তরঙ্গ।' কোন বিষয়ে যখন মন যাইবে, তখন চিন্তা কর—'ভগবানই ঐ বিষয়রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; উহা ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নয়।' যখনই কাহাকেও কোন কর্ম্ম করিতে

ছেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু শিষ্যগণের মনঃক্ষোভ ঘুচিল না। তখন নানক কাতরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভগবান! ভক্তের মান রক্ষা কর; তুমি অবোধগণকে জানিয়ে দেও, ভগবান ভক্তকে কখনও ছাড়েন নাই।" ভক্তের ভগবান সে রাত্রেই সোনার থালায় করিয়া মন্দিরের প্রসাদ দিয়া গেলেন। কিন্তু সকলে তা জানিতে পারিল না বলিয়া নানক আবার কাতরে নিবেদন করিলেন, "সমুদ্রের জল লবণাক্ত, তুমি এখানে সকলের পানের জন্য স্বচ্ছ, স্বাদু, সুশীতল গঙ্গাজলের উৎস সৃষ্টি কর।" ভগবান ভক্তের আব্দার রাখিলেন। আজও সে উৎস গুপ্ত-গঙ্গা নামে খ্যাত।

দেখিতে পাও, মনে কর—'ভগবানই ঐ শরীরে ঐ কর্ম্ম করিতেছেন; কর্ত্তা তিনি, কর্ম্মও তিনি, শরীরও তিনি।'

যখনই কাহারও কথা বা আচরণে তোমার অসন্তোষ, বিরক্তি বা ক্রোধ উৎপন্ন হয়, অমনি স্মরণ কর—'এই কথা বা আচরণের কর্ত্তা মঙ্গলময় ভগবান।' যখনই দুই জনের মধ্যে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়, অমনি মনে কর—'এক জনই এই দুই বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের অভিনয় করিতেছেন। প্রত্যেকেই ব্রহ্ম-স্বরূপ; কে ছোট, কে বড়?' কাহারও প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ জন্মিলে চিন্তা কর—'ঐ হৃদয়ে আমার আরাধ্যদেব নিবাস করিতেছেন; তিনিই ঐ লীলা-শরীর ধারণ করিয়াছেন এবং তিনিই ঐ শরীরের কর্ত্তা।' মনে রাখ—'যখনই কাহাকে ঘৃণা করি, তাহাতে ভগবানকেই ঘৃণা করা হয়; যখনই কাহারও প্রতি ক্রোধ করি, তখন ভগবানের প্রতিই ক্রোধ করা হয়; যখনই কাহারও নিন্দা করি, তাহাতে ভগবানেরই নিন্দা করা হয়।' সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া সমালোচনা ও দোষ-দর্শনাদি পরিহার কর। অন্যের দোষ-দর্শন আমাদিগের একটি গুরুতর দোষ; তাহা নিবারণ করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাক এবং বিচার ও প্রার্থনার সাহায্য গ্রহণ কর। যখন কেহ তোমার প্রশংসা করে, তখন মনে কর—'যে কর্ম্মের জন্য এই প্রশংসা হইতেছে, তাহার কর্ত্তা ত ভগবানই। তিনিই এক

শরীরে এক কর্ম্ম করেন, অপর এক শরীরে আবার সেই কর্ম্মের সমালোচনা করেন। এ'ই তাঁহার লীলা। এই সমালোচনার আবার গুরুত্ব কি?' জাতি-কুল, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ্য, ধন-মান কিম্বা গুণ বা সৌন্দর্য্যের জন্য যখন অভিমান জাগে, তখন মনে কর—'কর্ত্তা ত ভগবান, আমি অভিমান করিবার কে?' ভাব—'ভগবানই অভিমান করিতেছেন, এ অভিমান-তরঙ্গও ভগবানই।' মনে কর—'ভগবান তাঁর যে শরীরে যখন যেমন ইচ্ছা, সেই শরীরে তখন তেমনই খেলিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা হইলে শরীরের সাজ পরিবর্ত্তন করিতেও পারেন। যে শরীর আজ সুন্দর, কাল তাহা কুৎসিত হইতেছে, ধনী নির্ধন হইতেছে, বুদ্ধিমান বিকৃত-মস্তিষ্ক হইতেছে, বলবান দুর্ব্বল হইতেছে। পক্ষান্তরে, ছোট বড় হইতেছে, মূর্খ পণ্ডিত হইতেছে, নগণ্য ব্যক্তি সম্মানাস্পদ হইতেছে। দশ জন অপেক্ষা আমি অধিক গুণ-সম্পন্ন বটে, কিন্তু আমা অপেক্ষা গুণবান লোকের সংখ্যাও কম নহে। কোন না কোন প্রকারে প্রত্যেক শরীরই আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' চিন্তা কর—'দেহাত্মবুদ্ধি যতই বাড়িতেছে, ততই আমি ভগবান হইতে দূরে যাইতেছি।' ভাবনা কর—'সকলই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। সকল শরীরই আমার নিকটে সমান; তবে আর শরীর-বিশেষকে "আমি" বা "আমার" মনে করিয়া অভিমান-পাশেই বা বদ্ধ হইব কেন, আর সুখ-দুঃখের ফাঁদেই বা পড়িব কেন?'

চলিবার সময়ে মনে কর—'ভগবানই এই শরীরে চলিতেছেন।' বলিবার সময়ে মনে কর—'ভগবানই এই শরীরে বলিতেছেন।' আহারের সময়ে মনে কর—'ভগবানই আহার করিতেছেন, তিনিই আহার্য্য, তিনিই আহার।' কখনও মনে কর—'তিনিই সকল সাজিয়াছেন, তিনিই সকল শরীরে "আমি" "আমি" করিতেছেন; আমি ত তিনিই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।'

একটা কথা আছে। 'আমি ব্রহ্ম'—এ ভাব কোন কোন সাধকের ভাল লাগে না। কখনও কেহ মনে করে—'ভগবানই এই সকল হইয়াছেন। যা কিছু, সকলই তিনি। আমি তাঁর দাস। আমি যতদূর পারি, সকল শরীরে তাঁর সেবা করিব। ভগবানই সকল শরীরে শরীরী। সকল শরীর লইয়াই তাঁহার শরীর। প্রত্যেক শরীরই ভগবৎ-শরীরের এক একটী অবয়ব। তাই, যে কোন শরীরের সেবা করি, তাহাতে সর্ব্বময় বিশ্বাধারেরই সেবা করা হয়।' ধন, মন, বাণী ও শরীর দ্বারা যথাসাধ্য জীবগণের উপকার করিয়া, নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও অন্যের ক্ষতি এবং অসুবিধা-বোধ নিবারণ করিয়া সে মনে করে—সে ভগবানেরই সেবা করিতেছে। এইরূপ সেবা করিতেই সে ব্যগ্র, সেবা করিতে না পারিলেই তার অতৃপ্তি, সেবা করিবার সুযোগ পাইলেই তার আনন্দ। কোন শরীর দেখিলেই তাহাতে ভগবৎ-সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া সে

ভক্তিভরে প্রণাম করে। সে প্রত্যেককেই মঙ্গলময় ভগবান মনে করিয়া তৎকৃত ঘৃণা ও নিন্দা, প্রহার ও তিরস্কার অবিকৃতচিত্তে সহ্য করিয়া থাকে। সে দেব-মন্দিরে যাইয়া মনে ভাবে—'যদিও ভগবৎ-শরীরের-অবয়ব-স্বরূপ প্রত্যেক-শরীরেই তাঁহাকে পূজা করা যায়, তথাপি আমাদিগের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্য, আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের নিমিত্ত, তিনি অনন্ত থাকিয়াও এই সকল দেব-মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল বিগ্রহের চরণতলে যে প্রণাম এবং অর্ঘ্যাদি প্রদত্ত হয়, তাহা বিশ্ব-মূর্ত্তি অনন্তদেবকেই প্রদত্ত হয়, এবং তিনিই তৎসমুদয় গ্রহণ করেন।' সে প্রার্থনা করে—'হে ভগবন্! আমাকে অভিমানশূন্য কর, নির্দ্দোষ কর, প্রেমময় কর, তোমার সহিত যুক্ত করিয়া লও। হে ভগবন্! যা কিছু দেখিতেছি, তোমাকেই ত দেখিতেছি; তথাপি আমার মোহ-কালিমা দূর হয় না কেন? যা কিছু শুনিতেছি, তোমারই কথা শুনিতেছি; তবু আমার শান্তি হয় না কেন? যা কিছু খাইতেছি, তোমারই প্রসাদ খাইতেছি; তবু আমার প্রেম হয় না কেন? তোমার ভিতরেই সর্ব্বদা ডুবিয়া আছি, তবু আমার আনন্দ হয় না কেন? হে ভগবন্! আমাকে কৃপা কর। তোমাকে কোন শরীরে ঘৃণা করিতেছি, কোন শরীরে বিদ্বেষ করিতেছি, তবে তোমাকে কেমন করিয়া

পাইব, কেমন করিয়া ভালবাসিব ? হে দয়াময় ! আমাকে নির্ম্মল কর।'

আর এক শ্রেণীর ভক্ত আছে, সে সেবা করিতে চায় না। সে মনে করে—'আমার কতটুকু শক্তি, কতটুকু বুদ্ধি, কতটুকু জ্ঞান যে আমি সেবা করিব ! কখনও করিতে যাই কোন শরীরের দুঃখ-নিবৃত্তি,—কিন্তু বুদ্ধির দোষে এমন ভাবে সেবা করি, যাতে তার দুঃখ আরও বাড়িয়া যায় ! যাহা কাহারও পক্ষে অপকারজনক মনে করি, তাহা তাহার পক্ষে উপকারজনক বলিয়াই হয়ত তারপর বুঝিতে পারি। কোন্‌টা বাস্তবিক উপকার, কোন্‌টা বাস্তবিক অপকার, তাহা বুঝিতে পারি কই ? আর, তাহা না বুঝিলে কেমন করিয়াই বা সেবা করিব ? সেবা করিতে একমাত্র ভগবানই সমর্থ এবং তিনিই সর্ব্বদাই সকল শরীরের সেবা করিতেছেন। তিনি প্রেমময়, মঙ্গলময়, জ্ঞানময় ও সর্ব্বশক্তিমান। যে শরীরের জন্য যেরূপ সেবার প্রয়োজন, তিনি নিজেই সর্ব্বদা তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। বুঝি আর না বুঝি, তিনি সর্ব্বদা সকল শরীরের মঙ্গলই করিতেছেন। আমি অভিমানবশে সেবা করিতে যাইয়া তাঁহার শান্তিময়, সুশৃঙ্খলাময় ব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করিব ? আমার ও অন্যের জন্য—সমস্ত জগতের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন, তিনিই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আমি কেমন

করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি? আমার কোনই কর্ত্তব্য নাই। যত দিন অভিমান আছে, তত দিন যথাসম্ভব ভগবৎ-স্মরণই আমার একমাত্র কার্য্য;—তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাকে ভাবিব, তাঁহাকে দর্শন করিব।'

ভক্তদের আরও কত রকম ভাব আছে; পত্রে আর কত লেখা যায়? এই যে বিভিন্ন ভাবসকল, ইহার কোনটিকেই মন্দ মনে করিও না। প্রত্যেকটিই সিদ্ধিপ্রদ। তোমার মনে যখন যেটি উদিত হয়, তখন তদনুকূল ব্যবহারই করিও। মোটের উপরে একটি কথা মনে রাখিও,—'আমাদের মন সাধারণতঃ বিষয়ের দিকেই ধাবমান, নাম-রূপ লইয়াই ব্যস্ত। যখনই কোন বিষয়ের দিকে মন আকৃষ্ট হয়, তখনই, যে ভাবে হউক্, সেই বিষয়টিকে ব্রহ্মময় ভাবনা করিয়া মনটিকে একবার চৈতন্য-সমুদ্রে ডুবাইয়া লও। এইরূপ বারম্বার ডুবাইতে ডুবাইতেই মনে ব্রহ্মের রঙ্ ধরিবে। রঙ্ যখন পাকা হইবে, জীবনও তখন ধন্য হইবে।'

কন্‌খল্;

৫।১০।'১৭।

দ্বিতীয় অনুবাক্।

ওঁ
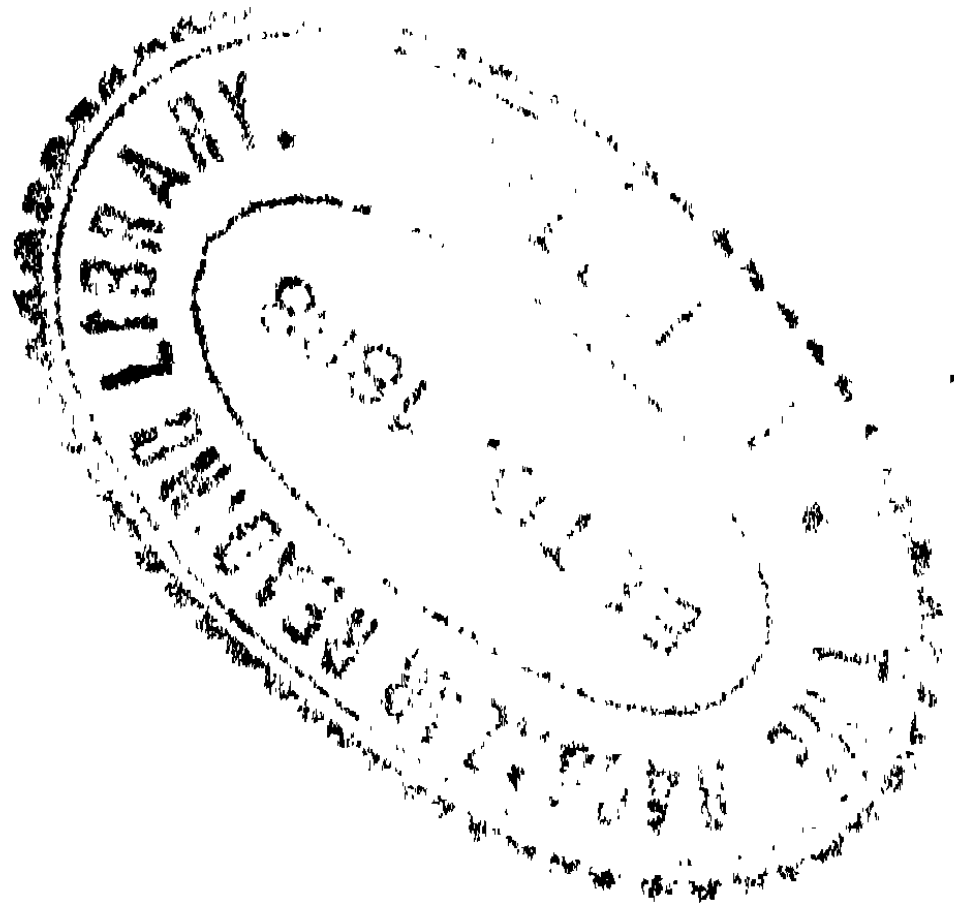
১। ভগবানই সৎ, আর যা কিছু সবই অসৎ। ভগবৎ-সঙ্গই সৎ-সঙ্গ।

২। নাম করিতে কোন নিয়ম নাই, কোন বিচার নাই। যত অধিক কাল সম্ভব, যত অধিক বার সম্ভব, নাম কর। বসিয়া থাকিতে নাম কর; যখন দাঁড়াইয়া থাক, নাম কর; যখন শুইয়া থাক, তখনও নাম কর। নাম করিতে শুচি অশুচি ভেদ নাই; কালাকাল নিরূপণ নাই; স্নানে, আহারে, ভ্রমণে, মল-মূত্র-ত্যাগে সর্ব্বদাই নাম করা যায় ও করিতে হয়। নামের সংখ্যা রাখিবারও আবশ্যকতা নাই; যে মনটুকু দ্বারা সংখ্যা রাখিবে, সেটুকু মনও নামামৃতে ডুবাইয়া দাও। সংখ্যাদ্বারা কি হইবে? যত বেশী বার পার, নাম লও। সাধনের সময় যদি না জোটে, হাতে কাজ করিতে থাকিয়াও মুখে নাম কর। ভাল লাগুক্ আর মন্দ লাগুক্, মন লাগুক্ আর নাই লাগুক্, নাম করিতে থাক। নাম করিতে করিতে—নামের গুণে সকল বাধা, সকল

অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। জ্ঞান, ভক্তি, ভগবদ্দর্শন—সকলই নামের গুণে মিলিবে। ধৈর্য্যের সহিত নাম করিতে থাক।

৩। সাধারণতঃ উত্তরমুখো হইয়াই ভজন করিতে বসা ভাল।

৪। যিনি তোমার প্রাণের ঠাকুর—যিনি তোমার আরাধ্যদেব, তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তিনিই বিশ্বেশ্বর, তিনিই বিশ্বময়, তিনিই বিশ্ব-মূর্ত্তি। তিনিই বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সাধকের উপাস্য। তাঁহাকেই বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন লোকে ডাকিতেছে। তাঁহারই মহিমা বিভিন্ন শাস্ত্র প্রচার করিতেছে। তিনিই বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ভক্তের মনোরঞ্জন করিতেছেন। তাঁহারই পূজা সকল মন্দিরে; তাঁহারই শক্তি সকল ভুবনে। প্রত্যেক মন্দিরে তাঁহাকেই প্রণাম কর, প্রত্যেক সাধককে তাঁহারই উপাসক মনে কর, প্রত্যেক নামে তাঁহাকেই স্মরণ কর এবং প্রত্যেক হৃদয়ে তাঁহারই প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শন কর।

৫। তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠা যেন বিদ্বেষে প্রতিষ্ঠিত না হয়; তোমার ধর্ম্ম যেন সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর না হয়;

তোমার জ্ঞান যেন বৈষম্য-দুষ্ট না হয়; তোমার প্রেম যেন সঙ্কীর্ণতা-পঙ্কিল না হয়।

৬। তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করুক্, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের নিকটে সমভাবে প্রণত হউক্। তোমার ধর্ম্ম-মন্দির উদারতার উচ্চ-শৃঙ্গোপরি প্রতিষ্ঠিত হউক্। তোমার জ্ঞানাগ্নি সমুদয় ভেদ-দর্শন নিরাশ করুক্; হিংসা, ঘৃণা ও স্বার্থপরতা তাহাতে সমূলে দগ্ধ হইয়া যা'ক্। তোমার প্রেম-গঙ্গা বিশ্বব্যাপিনী হইয়া সকলকে সমান ভাবে আলিঙ্গন করুক্; তাহাতে আনন্দ ও অমৃতের তরঙ্গ সর্ব্বদা খেলিতে থাকুক্।

৭। সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন বা পদ্মাসন—যেটি হউক্, যে কোন একটি আসনে অনেকক্ষণ অক্লেশে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করা মন্দ নয়।

৮। সন্ধ্যাকালটা বাজে কর্ম্মে ব্যয় করা ভাল নয়।

৯। যে যত ত্যাগী, যে যত ক্ষমাশীল, যে যত ধৈর্য্য-পরায়ণ, সে তত বড়।

বেদ-বাণী

১০। শ্রীকৃষ্ণের তিন শিষ্য,—অর্জ্জুন, গোপিনী ও উদ্ধব।

১১। যে স্বভাব-দাতা, সে কাহারও কোন অভাব দেখিলেই মনে করে, 'এর সম্পূর্ণ অভাবের প্রতিকার করা একক আমারই কর্ত্তব্য।' 'অন্যে কিছু করিতেছে না, আমি কেন করিব?'—এ সকল ভাব তার আসে না। ঐ অভাবের যতদূর প্রতিকার তার চেষ্টায় সম্ভব, ততদূর না করিয়া সে থামে না।

১২। অনেকে অনেক সময়ে করিতে যায় উপকার, কিন্তু হইয়া পড়ে অপকার।

১৩। আহার করিবার সময়ে সাত্ত্বিক ভাব বজায় থাকিলে তামসিক খাদ্যের দোষ অনেকটা দূর হইয়া যায়।

১৪। শুধু-শুধু কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া ভাল নয়।

১৫। যখন কেহ আচরণ-বিশেষ দ্বারা তোমার ক্রোধ, ঘৃণা বা বিরক্তি উদ্রিক্ত করে, এবং সেই চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ

দোষ তাহার স্কন্ধে অক্লেশে অর্পিত করিয়া তাহার মুণ্ড-চর্ব্বণের নিমিত্ত যখন তুমি কটি-বন্ধন করিতে প্রয়াসী হও, তখন—তার খাতিরে না হউক্, অন্ততঃ তার বিধাতার খাতিরে—কিছুক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া, একটু কাল চিন্তা করিও, 'ঐ চাঞ্চল্যের—ঐ দুর্ব্বলতার সম্পূর্ণ দোষ তাহারই কিনা? তোমার মন যদি সংযত হইত, তাহা হইলে অন্যের ব্যবহার তোমাকে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত করিতে সমর্থ হইত কিনা?' একটু কাল বিবেচনা করিও, 'তাহাকে তিরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিতে যে শক্তি ও সময় ব্যয়িত হইবে, তাহা তোমার মানসিক দুর্ব্বলতার দূরীকরণার্থে ব্যয় করিলে তোমার অধিকতর কল্যাণ হইতে পারে কিনা?' একটু কাল মনে করিও, 'যে দোষগুলি বহুপূর্ব্বেই সংশোধিত হওয়া উচিত ছিল, সেগুলির অস্তিত্ব এবং অনিষ্টকারিত্ব বিস্মৃত হইয়া যখন তুমি দুর্ব্বলচিত্ত লইয়া, সন্তোষের সহিত, ঘরকন্না করিতেছিলে, তখন যদি কাহারও ব্যবহার-বিশেষ তোমার গুপ্ত-দোষগুলিকে—সেই গুপ্ত ব্রণগুলিকে চোখের সাম্‌নে প্রকাশিত করিয়া দেয়, তবে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন কর্ত্তব্য কিনা?' একবার ভাবিও, 'পরীক্ষা দ্বারাই সকল শক্তি, সকল শিক্ষা, সকল অভ্যাসের প্রকার-ভেদ নিরূপিত হয়। পরীক্ষা হইতে পলায়নই চতুরতা নহে; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই পুরুষত্ব। এবারের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়াতে তোমার দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া যদি

তুমি পূর্ণ উৎসাহের সহিত ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও এবং অন্যের ঐরূপ "প্রতিকূল" আচরণগুলিকে যদি উন্নতি-বিধায়ক পরীক্ষা মনে করিয়া অভিনন্দন করিতে পার, তবে কি তাহা সাধকের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ হয় না?' একবার স্মরণ কর,—" 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' যে আচরণ তোমার চিত্তকে বিচলিত করিতেছে, তাহার কর্ত্তা অপর কেহ নহে,—তোমার প্রেমময়, মঙ্গলময় বিধাতা।" একবার বিচার কর, 'তুমি যদি দেহেন্দ্রিয়াদিকেই অজ্ঞান-বশতঃ আত্মা বলিয়া মনে না করিতে, তবে এই উত্তেজনা তোমার হইত কি না? এবং তোমার ভ্রান্তিবশতঃই যে দুঃখভোগ তুমি করিয়াছ, তজ্জন্য অন্যকে দোষী না করিয়া নিজেই লজ্জিত হওয়া উচিত কি না?' একবার ভাব, 'আমি আত্মা—সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময় আত্মা—ধীর, স্থির, অচল, অটল, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, উদাসীন আত্মা—কিছুতেই আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না—কিছুতেই আমাকে চঞ্চল করিতে পারে না;—স্পর্শ করিবে কে? আমি ভিন্ন আর কেহই নাই, আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই—আমি আনন্দস্বরূপ—আমি শান্তিস্বরূপ—আমি অমৃতস্বরূপ।'

১৬। ধর্ম্মের নামে—ধর্ম্মের আবরণে যেন কোন দুর্ব্বলতাকে [illegible] হইতে দিও না।

১৭। পরকে শিখাইতে যাইবার পূর্ব্বে নিজের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া লইও।

১৮। "Blessed are they that mourn ; for, they shall be comforted."—গীতার অর্জ্জুন এবং যোগবাশিষ্ঠের রামচন্দ্রের এই বিষাদ আসিয়াছিল ; তাঁহারা সান্ত্বনাও পাইয়াছিলেন।

ওঁ

১। যখনই কোন বৈষয়িক চিন্তা মনে উদিত হয়, অমনি বিচার ও প্রার্থনার সাহায্যে তাহাকে তাড়াইয়া দাও এবং যত অধিক ক্ষণ সম্ভব ভগবানকে স্মরণ কর। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় হারাইও না। ইহাই শান্তি-লাভের সহজ উপায়।

২। সংসার সত্য কি মিথ্যা—সে বিচার লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। সংসার যেন মনকে দখল না করে, ইহাই সর্ব্বদা দেখিতে হইবে।

৩। ভোজন যেন আমাদিগকে না খায়। আহার করিবার প্রাক্কালে সতর্ক হইবে যেন ভগবানকে বিস্মৃত না হও এবং স্বাদের দিকে মন না যায়।

৪। কোন কোন স্থানে মুসলমানেরা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-কালে হাসিয়া থাকে। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা

প্রায়ই কাঁদে না। বঙ্গদেশে কোন কোন সময়ে তান-লয় সহকারেও কাঁদে। গুজ্‌রাটে খুব বুক চাপ্‌ড়ায়। হাসি-কান্নাও কি অভ্যাস নয়? পাগল হইলে ত গো-বধেও আনন্দ পায়!

৫। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপেই ভগবানের হস্তে এবং অতীতের চিন্তা অনেক সময়েই বৃথা। এই মনে করিয়া সাধক কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকে এবং ভগবানকে ডাকে।

৬। কর্ম্ম সহজে তমাদি হয় না। মনকে আজ যে আহার দিবে, পঁচিশ বছর পরেও মন তাহার ঢেকুর তুলিতে পারে। তাই, সাবধান হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে।

৭। কোন দ্রব্য দেখিলে সংসারী মনে করে, 'ইহা কি কাজে লাগান যায়?' সাধক মনে করে, 'ইহা না হইলে আমার চলে কি না?'

৮। কোন বাসনা মনে উঠিলে চিন্তা করিবে, 'এ'টি লইলে ত ভগবানকে পাওয়া যাইবে না। দু'টির মধ্যে কোন্‌টি ভাল?'

৯। তিন জন সাধকের আধপেটা খাবার জুটিয়াছে। এক জন বলে,'উদর পূর্ণ করিয়া দাও, নহিলে ভজনের বিঘ্ন হইবে।' আর একজন বলে, 'তুমি মঙ্গলময় বিধাতা, যেটুকু দিয়াছ, নিশ্চয়ই এই খাদ্যটুকুতেই আমার মঙ্গল। তাই, এটুকুতেই যেন সন্তুষ্ট থাকিয়া তোমাকে ডাকিতে পারি।' তৃতীয় বলে, 'এ শরীরকে খাদ্য দাও বা না দাও, অল্প দাও আর বেশী দাও,—সে ত তোমার কাজ; সে দিকে আমার মন যাবে কেন? আমার ষোল-আনা মন যেন সর্ব্বদা তোমাতে থাকে।'

১০। ডাকা'ত তোমার যথাসর্ব্বস্ব লুট করিয়া দৌড়াইল। তুমি পুনরুদ্ধারের আশায় পেছনে পেছনে ছুটিলে। কতক্ষণ পরে যখন কিয়ৎ পরিমাণে ক্লান্ত হইয়াছ, তখন ডাকা'ত তোমায় একটী পুটুলি হইতে একখানা কাপড় ফেলিয়া দিল। তা লইয়াই তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিলে; ডাকা'তও 'আপদ চুকিল' ভাবিয়া, হাসিতে হাসিতে চলিল। অনেক সাধকই ভগা-ডাকা'তের নিকট হইতে এইরূপ অনুগ্রহ পাইয়া ফিরিয়া আইসে।

১১। যাহারা সিদ্ধাই দেখিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়, তাহাদের সিদ্ধি-লাভ সুকঠিন।

১২। পুতুল-বাজি ত অনেক কাল দেখিলে! এখন একবার খেলার ঘর ছাড়িয়া পেছনের ঘরে চল—খেলোয়াড়কে দেখিবে; তখন খেলার সমুদয় রহস্যই টের পাইবে।

১৩। কোন মজার কথা শুনিয়া, ভাল খাবার পাইয়া, প্রিয় বন্ধুকে হঠাৎ দেখিয়া, একটি পয়সা হারাইয়া যদি ভগবানকে ভুলিয়া যাই, তবে ভগবানে অনুরাগ বা কত, আর বৈরাগ্যই বা কি?

১৪। মৃত্যু-কালে ভগবচ্চিন্তা প্রয়োজন। অথচ, "মরণের অবধারিত কাল নাই।" তবে ভগবানকে ভুলি কি করিয়া?

১৫। ভগবান এমনই ভালমানুষ যে তাকে যতই জান্‌বে, ততই তার উপর টান বাড়্‌বে; আবার সে টানে যতই তার দিকে এগোবে, ততই তাকে বেশী বেশী জান্‌তে পারবে।

১৬। এমন স্থানে ও এমন ভাবে সাধন করিতে বসিবে, যেন অন্যে তথায় তখন যাইতে না [illegible]

১৭। 'এক ঘণ্টা ভজন করিয়া তারপর বাজারে যাইব'—এরূপ ঠিক করিয়া সাধন করিতে বসিলে আসনে বসিয়া অনেক সময়েই মাছ কিনিতে হয়। 'যতক্ষণ পারি, সাধন করিব ; কোন বাধা নাই'—এই চাই।

১৮। নিরভিমান না হইলে ভক্তি-লাভ হয় না।

১৯। তুমি কি মুক্তি কামনা করিতেছ? বিষয়ের তীব্র জ্বালা হৃদয়ে অনুভূত হইতেছে কি? বাসনাই বন্ধন—ইহা বেশ বুঝিয়াছ কি? আসক্তিই ভয়,আশঙ্কা ও সন্দেহের মূল—তাহা জানিয়াছ কি? ভেদজ্ঞানই দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ—ইহা উপলব্ধি করিয়াছ কি? এ যদি হইয়া থাকে, তবে তুমি সাধক বট। সরল অন্তঃকরণে ভব-বন্ধন-হারীর নিকটে প্রার্থনা কর, পূর্ণকাম নিশ্চয়ই হইবে।

২০। প্রত্যেক উত্থান ও পতনে, জয় ও পরাজয়ে, সম্পদ ও বিপদে, রোগ ও ভোগে, সৎ ও অসৎ আচরণে,—প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক প্রাণী উন্নতির দিকে—কল্যাণের দিকে ধাবমান হইতেছে,—ইহা কি সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর? নতুবা, 'ভগবান মঙ্গলময়'—ইহা ত কথার কথা মাত্রই হইবে। 'তিনি

মঙ্গলময়'—এ বিশ্বাস বদ্ধমূল না হইলে তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভরতাই বা আসিবে কেন ?

২১। দ্বৈতবাদ সত্য কি অদ্বৈতবাদ সত্য, ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার, নির্গুণ কি সগুণ,—এ সকল তত্ত্ব যুক্তি-তর্ক দ্বারা মীমাংসা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইও না। যে ভাব তোমার ভাল লাগে, তাহা অবলম্বন করিয়াই, সরল ভাবে, সাধন-পথে অগ্রসর হইতে থাক। যথাসময়ে সকল রহস্যই তোমার নিকটে প্রকাশিত হইবে।

২২। আগন্তুক লোককে রাস্তার প্রত্যেক চৌমাথায়ই নূতন নূতন লোকের সাহায্য লইতে হয়। একই গঙ্গার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পাণ্ডার সাহায্য প্রয়োজন। একই স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন মাষ্টার পড়ান। শাস্ত্রেও আছে—গুরোর্গুর্ব্বন্তরং গচ্ছেৎ।

২৩। একটা সহজ উপায় আছে। সমুদয় গোল-মালের মূল এই শরীরটা। এটাকে ভগবানের কাছে ফেলিয়া দাও ; তারপর, নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁর নাম কর।

২৪। 'ভগবানই কর্ত্তা, আর সব অকর্ত্তা'—এটি বেশ

চিন্তা করা চাই। সকল কর্ম্ম ও সংকল্পের সময়েই যেন এটি মনে থাকে।

২৫। সাধন-কালে একমাত্র উপদেষ্টাই সঙ্গী, অপর কেহ নহে।

২৬। সাধককে অনেক সময়ে বলিতে হয়—
"O Lord, save me from my friends."

২৭। যে ভগবানে নির্ভর করিতে না পারে, তাহার একজন উপদেষ্টার উপর নির্ভর করা চাই। নিজের বুদ্ধিতে চলিবে না।

২৮। পত্রিকা পড়া সাধকের কর্ত্তব্য নহে।

২৯। অবিশ্বাসী ও নাস্তিকের সঙ্গ কিছুতেই করিবে না।

৩০। প্রথম প্রথম তীর্থ ভ্রমণ করা মন্দ নহে।

কর্ণবাস।

ওঁ

১। আজ দেওয়ালী। এই দিনে হিরণ্ময়ী রুক্মিণী দেবী নরকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাই, আজ হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থানে "দীপাবলী"র উৎসব। তোমরাও এই উৎসব সুসম্পন্ন কর। প্রেমময়ী বিশ্বজননীর নিকটে প্রার্থনা কর—মায়ের কাছে ছেলের মত আব্‌দার কর,—তাঁর কৃপায়, তাঁর ইচ্ছায় অজ্ঞানাসুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক্‌—মোহান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করুক্‌।

২। প্রত্যেক হৃদয়-কাননে এই উৎসবের আয়োজন হউক্‌। দ্বেষ ও হিংসা, দর্প ও অভিমান, কপটতা ও সঙ্কীর্ণতা—এই আগাছাগুলিকে সযত্নে উৎপাটিত কর। ক্ষমা ও ধৈর্য্য, সত্য ও সরলতা, সংযম ও পবিত্রতা—এই সকল পুষ্প-তরুর রক্ষণ ও বর্দ্ধন কর। কেন্দ্র-স্থলে ভক্তির উৎস নাচিতে থাকুক্‌। তাহা হইতে জ্ঞান-মন্দাকিনীর অমৃত-ধারা প্রবাহিতা হইয়া সমুদয় বাগানকে সঞ্জীবিত ও শোভায়মান করিতে থাকুক্‌। পুলিনে ফুল্ল-কুসুমোপরি

উপবিষ্ট হইয়া বিহঙ্গমগণ জীব-প্রেম—বিশ্ব-প্রেমের সুমধুর ঝঙ্কারে দশ দিক পরিপূরিত করুক্। সন্তোষের মৃদু হিল্লোল সমুদয় শ্রান্তি বিদূরিত করুক্। স্নিগ্ধোজ্জ্বলকান্তি লাবণ্যময়ী শান্তিদেবীর মণিমণ্ডিত সিংহাসন রত্নবেদীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হউক্। তাঁহার রূপের বিমল ছটা দশ দিক আলিঙ্গন করুক্। পত্র ও পুষ্প, পুলিন ও তরঙ্গ, জল ও স্থল—সর্ব্বতঃ-প্রতিফলিত আলোকমালা হৃদয়-কাননকে অতুলশোভাসম্পদের অধিকারী করুক্।

৩। ভক্তি-লাভই যদি না হইল, তবে জীবন-ধারণে ফল কি?

৪। 'পুষ্পের পরিবর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্রের মত নয়ন প্রদান করিব'—এমন ভক্তি ত আমার নাই, তবে তোমার পূজা করিব কিরূপে? শরীর—দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্লেশ-সহনে অক্ষম; তোমার সেবাতেই বা আমার অধিকার কই? মন—চঞ্চল, অসংযত, বাসনাপীড়িত; ধ্যানের সম্ভাবনাই বা আমার কোথায়? হে ভগবন্! আমি একান্তই তোমার কৃপাপাত্র। হে দীনদয়াল! আমাকে যদি উদ্ধার করিতে না পার, তবে তোমার পতিতপাবনী শক্তিরও সীমা আছে বলিতে হইবে।

৫। হে ভগবন্! তুমি সকলই আকর্ষণ ও ধারণ

করিতেছ। আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিতেছ না কেন? মধুভাণ্ড ছাড়িয়া আমার ভ্রমর-মন দিগ্-দিগন্তে বৃথা ছুটাছুটি করিতেছে কেন?

৬। হে প্রেমময়! গুণময়ী প্রকৃতিরাণী সর্ব্বদাই তোমার পূজায় নিবিষ্টচিত্ত—আত্মহারা! আমি যে দিকে চাই, তাঁহার উপরেই আমার দৃষ্টি পতিত হয়, তোমার মধুর মূর্ত্তি আমি দেখিতে পাই না! হে কৃপানিধান! দয়া করিয়া এ আবরণ অপসারিত কর।

৭। হে ভগবন্! আমি আর কিছুই চাই না,—আমার মন যেন সর্ব্বদাই তোমার পাদ-পদ্ম চুম্বন করিতে থাকে।

৮। আমাকে গৃহস্থই কর আর গৃহত্যাগীই কর, চণ্ডালই কর বা ব্রাহ্মণই কর, মানুষই কর কিংবা কীট-পতঙ্গই কর, ধনীই কর আর দরিদ্রই কর, নিন্দিতই কর অথবা প্রশংসনীয়ই কর,—কিছুতেই আমার আপত্তি নাই, যদি হে ভগবন্! আমার হৃদয়-সিংহাসনে তুমি সর্ব্বদা বিরাজমান থাক।

৯। তুমি অগণিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত ভার সর্ব্বদা অনায়াসে বহন করিতেছ,—আর আমার মন কি এতই ভারী যে তাহা তুমি গ্রহণ করিতে পারিতেছ না?

১০। হে ভগবন্! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, এ শরীরেও তাহা আছে। এ শরীরে যা কিছু আছে, এ হৃৎ-পুণ্ডরীকে তৎসমুদয়ই আছে। এই হৃৎপদ্মেই তোমার পূজা করিব, হৃৎপদ্মেই তোমাকে দর্শন করিব, হৃৎপদ্মই তোমার সম্মুখে বলি প্রদান করিব।

১১। মন যখন ভগবন্ময় হয়, তখন জগৎও ভগবন্ময়, মধুময় হইয়া যায়। আর মন যতক্ষণ বিষয়াভিমুখ থাকে, ততক্ষণই জগৎ জড় ও দুঃখময়।

১২। ধ্রুবের মন যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন প্রতিপত্রের পতনে সে মনে করিতেছিল —'এই বুঝি তিনি আসিতেছেন'। ব্যাঘ্রের ভয়াবহ মূর্ত্তি নয়নগোচর হইলেও সে মনে করিয়াছিল—'এই বুঝি প্রেমময় আসিয়াছেন'।

১৩। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির বলে ভগবানকে লাভ করা বড়ই কঠিন। হয়, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত হও; নতুবা, যোগ্যতর 'উপযুক্ত' ব্যক্তির অধীনতা স্বীকার কর।

১৪। ভ্রমণে অনেক কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দূর হয়; ইহাতে আরও অনেক উপকার আছে।

১৫। সাধ্যানুসারে মাঝে মাঝে লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত, পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়ান—গৃহস্থের একটি উৎকৃষ্ট কর্ম্ম।

১৬। বিশেষ ভাগ্যের ফলেই লোকে সেবা করিতে সমর্থ হয়।

১৭। কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ভগবানের প্রীত্যর্থে সম্পন্ন করিতে যত্নবান হও।

১৮। সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত পরমুহূর্ত্তের প্রতি যখন বিন্দুমাত্রও হাত নাই, তখন আর ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনা লইয়া সময়ের অপব্যবহার করিব কেন?

১৯। শিবনেত্র বা শবনেত্র হইবার জন্য, নাক টিপিয়া শ্বাসবন্ধ করিবার জন্য, অঙ্গভঙ্গিসহকারে আসনবিশেষে অভ্যস্ত হইবার জন্য—অত ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতেছ কেন? যে ভাবে বসিলে কষ্ট না হয়, এমন 'সুখাসনে' বসিয়া মন ভগবানে লাগাইয়া দাও। শরীরের অঙ্গসংস্থানাদির চিন্তা তোমায় করিতে হইবে না। মন যখনই ভাবরসে ডুবিবে, তখনই চক্ষু উপযুক্তভাবে আপনাআপনিই বিন্যস্ত হইবে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও আপনাআপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে, শরীরও

নিজে নিজেই স্থির হইবে। (মনে কিন্তু করিও না যে আসন ও প্রাণায়ামকে নিরর্থক বলিতেছি।)

২০। যাহাদিগকে ঘৃণা কর, যাহাদিগকে নিন্দা কর, যাহাদিগকে দ্বেষ কর, তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ হয়ত তোমার পূর্ব্বেই লক্ষ্যস্থানে পহুঁছিতে সমর্থ হইবে; হয়ত তাহাদিগের অনুগ্রহও তোমার পক্ষে প্রয়োজন হইবে।

কর্ণবাস;

দেওয়ালী, ১৩২৩।

ওঁ

১। যদি নিত্যানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে মনকে শান্ত করিতে হইবে।

মনকে শান্ত করিবার জন্য, তাহাকে একনিষ্ঠ—একাগ্র করা প্রয়োজন।

মনের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য, প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে, ধ্যান-যোগ, জ্ঞান-যোগ, লয়-যোগ, মন্ত্র-যোগ, প্রপত্তি-যোগ প্রভৃতি অবলম্বনীয়।

যদি যোগে শ্রদ্ধা ও অধিকার লাভ করিতে বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচরণ করিতে হইবে।

সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র হইতে ইন্দ্রিয়সংযমের উপায় ও সদাচরণের উপদেশ মিলিবে।

২। নবীন বয়সেই পুণ্ডরীকের কর্ম্মজীবনে এমন শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও নিপুণতার প্রীতিকর সমাবেশ হইয়াছিল যে তাঁহার ক্ষুদ্র, বৃহৎ প্রত্যেক

কর্ত্তব্যটিই অতি সুন্দরভাবে—অতি পরিপাটি রূপে অনুষ্ঠিত হইত। একদিন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা আহারান্তে শয়ন করিয়া আছেন; তাঁহার চরণোপান্তে বদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পুণ্ডরীক পিতৃ-পদ-যুগল স্বীয় উরুদেশে সংস্থাপিত করিয়া অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহার সেবা করিতেছেন। যুবক হঠাৎ মস্তকোত্তোলন করায় দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে —অনতিদূরে যশোদানন্দবর্দ্ধন, প্রেমময় বাসুদেব কটিদেশে হস্তদ্বয় রক্ষা করিয়া প্রসন্নবদনে দণ্ডায়মান! পুণ্ডরীক— পিতৃসেবারত পুণ্ডরীক তদবস্থায় থাকিয়াই ভূলুণ্ঠিত শিরে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন, এবং প্রণামান্তে গদ্‌গদ্‌ বচনে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! যদি কৃপা করিয়া দেখাই দিয়াছ, তবে হে দয়াময়! আমাকে ক্ষমা কর। আমি পিতৃসেবায় নিযুক্ত;—উঠিয়া, তোমার চরণ বন্দনাদিও করিতে পারিতেছি না। হে কৃপানিধান! যদি প্রসন্ন হইয়া এখানে পদার্পণই করিয়াছ, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিকটস্থ ইষ্টকখণ্ড গ্রহণ করিয়া তদুপরি উপবেশন কর।" দিব্য-মধুর-মূর্ত্তি ভগবান সহাস্য বদনে বলিলেন, "পুণ্ডরীক! আমার বসিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যে প্রেমের সহিত পিতৃ-সেবা করিতেছ, উহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। উহা দেখিবার জন্যই এখানে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি পদ-সেবায় এমন তন্ময় হইয়াছিলে যে এতক্ষণ আমাকে দেখিতেই পাও নাই। আমি এখন চলিলাম। তোমার মঙ্গল হউক্।" ভগবান

নন্দ-নন্দন এই ভাবেই দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তদবধি এই কটি-ন্যস্ত-বাহু বিঠ্ঠলদেব বা বিঠোবা বাবা মহারাষ্ট্রের গৃহে গৃহে পূজিত হইতেছেন। তখন হইতেই পুণ্ডরপুর মহারাষ্ট্রের—তথা সমগ্র হিন্দুস্থানের একটি পবিত্র তীর্থ।

৩। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ও ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের প্রভেদ অবগত হও।

৪। যাহা কিছু পাইবার সাধ থাকে, সে সকলের জন্যই ভগবানের উপর নির্ভর করিতে যত্নশীল হও। যাহা কিছু পাইতেছ, সকলই ভগবানের নিকট হইতেই পাইতেছ।

মনে রাখিও, তিনিই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা।

৫। ভক্তিই সাধনের ভিত্তি।

৬। অপরাহ্ন কাল। মেলা বসিয়াছে। পিতার হস্ত ধারণ করিয়া একটি মুসলমান বালিকা এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে মেলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ বালিকা একখানি পুতুলের দোকানের সাম্‌নে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। পিতাকে বলিল, "বাবা! ঐ পুতুলটি

আমাকে কিনিয়া দাও।" পিতা বলিল, "মা! এ কাফেরের দেবতা। এ মূর্ত্তিতে কাজ নাই। আর কোন পুতুল কিনিয়া দেই।" বালিকা সে কথা মানিল না। সে বলিল, "ঐটির মত সুন্দর পুতুল আর একটিও নাই। আমি ঐটিই চাই।" অগত্যা সেই পুতুলটিই কেনা হইল। বাড়ী আসিয়াই বালিকা পুতুলটিকে লইয়া খেলিতে বসিল। কিছু দিন পর হইতে সে পুতুল-খেলায়ই প্রায় সমস্ত সময় কাটাইতে লাগিল। শেষে, তার আর কিছুই ভাল লাগে না;—কেবলই পুতুল-খেলা;—দিন-রাত পুতুল-খেলা। সে পুতুলটিকে আর পুতুল মনে করিত না;—পুতুল তার খেলার সঙ্গী। বালিকা আর পুতুল দুজনে এক সঙ্গে খেলিত, নাচিত, হাসিত, কথাবার্ত্তা বলিত। উভয়ের কথোপকথন মাঝে মাঝে অন্য ২।১ জন লোকেও শুনিতে পাইত। উপযুক্ত বয়সে বালিকার বিবাহের আয়োজন হইল। বালিকা বলিল, "পুতুলের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে; আমি আর বিবাহ করিব না।" বিবাহ দিতে কিছুকাল চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হওয়াতে পরিশেষে অভিভাবকবর্গ নিরস্ত হইল। লীলাময়ের কি অপার মহিমা! বালিকার সরল প্রেমের পুণ্য কিরণে ক্রমে ক্রমে আত্মীয়গণের হৃদয়ও রঞ্জিত হইল! কিছুকাল পরে তথায় গগনস্পর্শী মন্দির নির্ম্মিত হইল। তন্মধ্যে কনকাসনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাসমারোহে তাঁহার দৈনন্দিন পূজার

ব্যবস্থা হইল। আজও সিন্ধু-দেশে সেই মন্দির বিরাজমান। আজও না কি তথায় কতিপয় সহস্র কৃষ্ণভক্ত মুসলমান-সন্তান এক সম্প্রদায়বদ্ধ থাকিয়া বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

৭। কদাপি এমন ভাবে কাহারও সেবা করিও না যাহাতে তার অসুবিধা হয়।

৮। নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে যাইয়া যেন প্রকারান্তরে জড়োপাসক হইও না। ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ।

৯। যাহাতে তোমার সুবিধা বা অসুবিধা, তাহাতে অন্যের সুবিধা বা অসুবিধা বোধ না হইতেও পারে।

১০। অতিরিক্ত ভোজনের অনেক দোষ।

১১। রামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"হনুমান্! জল হইতে বিযুক্ত হইলে ত মৎস্য প্রাণধারণ করিতে পারে না; তবে আমা হইতে বিযুক্ত হইলেও সীতার শরীরে প্রাণ আছে কিরূপে?" মহাবীর উত্তর করিলেন, "ভগবন্! শরীর হইতে প্রাণ বাহির হইবে কিরূপে? প্রাণ শরীরের মধ্যে আবদ্ধ; শরীরের কপাট রুদ্ধ, কপাটে তালা বদ্ধ,

তালার সম্মুখে সতর্ক প্রহরী দণ্ডায়মান। তোমার ধ্যানই সেই কপাট, পাদাঙ্গুষ্ঠে নিবদ্ধ দৃষ্টিই চাবিবদ্ধ তালা এবং তোমার নামই সতর্ক প্রহরী।”

১২। ক্ষণিক আমোদের জন্য, বন্ধুবর্গের প্রীতির জন্য, অনিচ্ছা বা অলসতার জন্য, কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম ভঙ্গ করিও না।

১৩। সত্য-রক্ষার জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিবে। যত-ক্ষণ চতুরতা ও কপটতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ ধর্ম্ম-লাভ হইতেই পারে না।

১৪। মুমুক্ষু সাধক সম্মানের লোভ করিবে না, বরং অবিকৃতচিত্তে অপমান সহ্য করিতে সচেষ্ট হইবে।

নিরীকারী আশ্রম,
কন্‌খল্‌;
১৪।৮।’১৭।

ওঁ
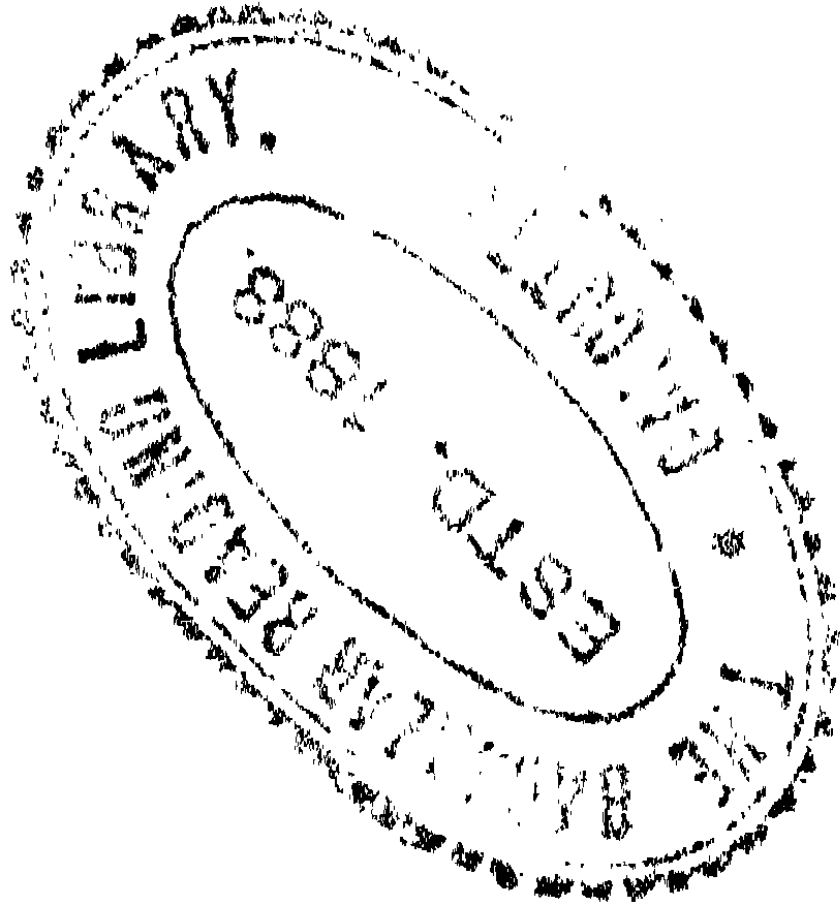
১। অবিদ্যার জন্যই দুঃখে সুখবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি এবং অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি জন্মে।

২। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ব্যতীত আর কিছুতেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না।

৩। নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন কর। উপাসনা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি বৈধ উপায়ে, ভগবৎ-প্রীতি কামনায়, শ্রদ্ধা ও সংযমের সহিত, সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে থাক। ক্রমে ক্রমে অভিমান বিগলিত হইবে, চিত্ত নির্ম্মল হইবে, জ্ঞান (অভেদ দর্শনং জ্ঞানং) প্রকাশিত হইবে।

জ্ঞান ঈশ্বরারাধনার সহিত অন্বিত হইয়া সাধককে বৈরাগ্যবান করে।

বৈরাগ্য এবং উপাসনার অভ্যাস হইতে মনস্থৈর্য্য জন্মে।

স্থির শান্ত মনে ব্রহ্ম-ধ্যান করিতে করিতে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

৪। সাধনে শ্রদ্ধা না জন্মিলে সিদ্ধিলাভ হইবে কিরূপে ?

৫। সন্তোষ লাভ করিবার জন্য বৈরাগ্য ও তিতিক্ষা এ উভয়েরই প্রয়োজন।

৬। অভ্যাস ও তত্ত্ব-বিচার দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়।

৭। সাধনকে অভ্যাস করিতে করিতে এমনভাবে অস্থি-মজ্জা-গত করিয়া লইতে হইবে যে আমাদের মন যেন রোগ এবং শোকে, সম্পদ এবং বিপদে, কর্ম্ম-জীবনে এবং মৃত্যু-কালে ভগবানকে বিস্মৃত না হয়।

৮। অনেক ঋণ জমিয়াছে , ইহা শোধ করিতে হইলে, বর্ত্তমান ব্যয় অপেক্ষা বর্ত্তমান আয় বেশী হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান ব্যয় অপেক্ষা বর্ত্তমান আয় যত বেশী হইবে, তত কম সময়ে ঋণ শোধ করিতে পারিবে।

৯। যদি মনের চাঞ্চল্যই হয়, তবে তাহা ভগবানকে লইয়াই হউক্।

১০। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে যেন রাগ, দ্বেষ এবং অভিমান না জন্মে।

১১। সাধক যখন ভগবানের কৃপাবলে তাঁহার শক্তি, ঐশ্বর্য্য এবং মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তার ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মে।

বিশ্বাস হইতে প্রীতি এবং প্রীতি হইতে ভক্তি লাভ হয়।

১২। গিয়াছি ঠাকুর দেখিতে ; কিন্তু, ঠাকুর-বাড়ীর ঐশ্বর্য্য, মন্দিরের কারুকার্য্য, ঠাকুরের পোষাকের পারিপাট্য প্রভৃতির আলোচনাতেই মন ব্যস্ত ; ঠাকুরের প্রতি প্রেম কতটুকু ?

১৩। একটা নিয়ম আছে—রাজসিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক মাংস খাইতে ভালবাসে ; আবার, মাংস খাওয়ার ফলে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়।

১৪। বই পড়িয়াই সমুদয় জ্ঞাতব্য জানা যায় না, কতকগুলি কথা শুনিয়া লইতে হয়।

কন্‌খল্‌ ;

৪।৯।'১৭।

ওঁ

১। অবিদ্যার দুইটী গ্রন্থি :—অহংতা ও মমতা।

২। একটী মাত্র পদার্থেও যদি আসক্তি থাকে, পঞ্চাশটী পদার্থ তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

৩। যত দিন মনে দুইটি বিপরীত বৃত্তি-প্রবাহ থাকিবে, তত দিন দুঃখ-নিবৃত্তির আশা কোথায়?

৪। ধন ও মানের বাসনা যখন জাগে, তখন সাধকের মন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে এবং কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে।

৫। যে ব্যক্তি ভগবৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সকল ত্যাগ করিয়াছে, ভগবান কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন?

৬। বৈরাগ্য-ভাস্কর উদিত হইলে ভক্তি-পদ্ম আপনিই প্রস্ফুটিত হয়।

৭। ভক্ত কখনও নিজকে প্রচার করে না।

৮। লোক যেমন যত্নপূর্ব্বক স্বীয় কুকর্ম্ম গোপনে রাখে, তুমি তোমার সাধনও তেম্‌নি গোপনে রাখ।

৯। ধর্ম্মাচরণ—লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়, ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হও, তা'তে লোকে যা ভাবে ভাবুক্।

১০। সকলকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। যাহাই কর,—কাহারও প্রীতি, কাহারও অপ্রীতি ঘটিবেই। তবে আর লোক-রঞ্জনের জন্য কর্ত্তব্যকে পরিত্যাগ করিবে কেন?

১১। লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই হউক্, কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্যেই হউক্, কখনও সরলতাকে পরিত্যাগ করিও না।

১২। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা একত্রে বনগমন করিলেন। রাম—বিবেক, লক্ষ্মণ—বৈরাগ্য, সীতা—ভক্তি।

১৩। একজন সাধু কাহাকেও উপদেশ দিতেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর করিলেন, "এখনও আমার হৃদয়ে উপদেশ দিবার বাসনা জাগ্রত হয়, তাই উপদেশ দিই না।"

১৪। একজন সাধু প্রায়শঃই চুপ করিয়া থাকিতেন। কাহারও সমালোচনা করিতেন না, কোন-তর্ক-বিতর্কেও যোগদান করিতেন না। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন, "সত্য বলিলে জগতের অপ্রীতি, আর মিথ্যা বলিলে ভগবানের অপ্রীতি ;—তাই অনেক সময়েই চুপ করিয়া থাকি।"

১৫। আর একজন সাধুর কথা শোন। প্রায় ত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে—তিনি তখন ৺কাশীধামে থাকিতেন—একদিন এক গুণ্ডার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় একটি গলির পার্শ্বে পড়িয়াছিলেন। কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে সাধু যেন কিছু সুস্থতা বোধ করিলেন ও কথা বলিতে সক্ষম হইলেন। "কে আপনাকে প্রহার করিয়াছে ?"—জিজ্ঞাসিত হওয়ায় তিনি উত্তর করিলেন, "যিনি সেবা করিতেছেন,

তিনিই প্রহার করিয়াছেন।" অল্পকালের মধ্যেই কয়েক-জন পুলিশ ও নাগরিকের চেষ্টায় অপরাধী গুণ্ডাটী ধৃত হইয়া তথায় আনীত হইল। একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী সাধুকে বলিলেন, "এই লোকটীই আপনাকে প্রহার করিয়াছে কিনা, বলুন।" সাধু উত্তর করিলেন, "আহা! এই শরীরটীকে এত ক্লেশ দিতেছ, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এ শরীর যে ভগবানের মন্দির!" এই বলিয়া উদ্দেশ্যে ভগবানকে প্রণাম করিলেন।

১৬। আরও একজন সাধুর কথা বলি। ইনি এখনও জীবিত আছেন। এক সময়ে ইহাঁর ইচ্ছা হইয়াছিল, তপস্যার অনুকূল একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিছুদিন পরে ইহাঁর পায়ে একটী ফোড়া হইল। ফোড়াটী কিছু যন্ত্রণাও প্রদান করিল। তিনি ভাবিলেন, "একটী সামান্য ফোড়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমি অসমর্থ, আর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতে নিজকে সমর্থ মনে করিতেছি! ধিক্ আমার অভিমানে।" আর আশ্রম করা হইল না!

১৭। তুমি যখন নির্জ্জনে বসিয়া থাক তখনও তথায় যে চৈতন্য বিরাজমান, কোন মূর্ত্তি নিকটস্থ হইলেও সেই

চৈতন্যই তথায় বিরাজমান। তুমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলেও তথায় সেই চৈতন্য বর্ত্তমান। একই চৈতন্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বর্ত্তমান।

১৮। কৃপণতা সাধকের দুঃখের কারণ।

ওঁ

১। অষ্ট পাশ কি জান? কুল, শীল, মান, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, আশঙ্কা ও জুগুপ্সা—এই আটটি। পাশবদ্ধ—জীব; আর, পাশমুক্ত—শিব।

২। সংসার-সাগরের ছয়টী তরঙ্গ মানুষকে বিব্রত করে। শোক ও মোহ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, জরা ও মৃত্যু—এই ষড়োর্ম্মি। প্রথম দুইটি মনের, তার পরের দুইটি প্রাণের ও শেষ দুইটি শরীরের ধর্ম্ম।

৩। মোক্ষের সাধন তিনটী—তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ। যোগবাশিষ্ট বলেন, এককালেই এই তিনটীর অভ্যাস করিতে হইবে।

৪। একত্বদর্শী সাধকের পক্ষে লোকের সদসৎ ব্যবহারের বিচার ও সমালোচনা কর্ত্তব্য নহে।

৫। গীতা বলিয়াছেন, "মনঃপ্রসাদঃ"। ধাতু-বৈষম্য যেন না ঘটে। সহিষ্ণুতা ব্যতীত সিদ্ধি-লাভ হয় না।

৬। ভগবান তাঁহার বিশাল রাজ্যসমূহে অনন্তপ্রকারের বৈষম্য, বৈপরীত্য ও শত্রুতার পালন ও পোষণ করিতেছেন, আর আমরা আমাদিগের স্ব স্ব প্রকৃতি হইতে এক চুল পরিমাণ বিভিন্নতাও সহ্য করিতে নারাজ!

৭। যে যে বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে, সেই সেই বস্তুর সুখরূপত্ব বিচার দ্বারা বর্জ্জন করিয়া পরিণাম দুঃখ-হেতুত্ব দর্শন করিতে হয়। আরও চিন্তা করিতে হয়, 'এইটি আমাকে সাধন-পথ-ভ্রষ্ট করিবার জন্যই মনোমোহনরূপে সমাগত হইয়াছে; আমাকে অধঃপাতিত করিয়াই, বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। তখন অনুতাপ—বৃথা অনুতাপই সার হইবে।'

৮। যারা সংসারে "আপনার জন", তারাই ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা প্রদান করে, তারাই উন্নতির পরিপন্থী!

৯। আসক্তিবশতঃই—মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; বুদ্ধি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়; দুঃখ, দৈন্য, ভয় ও সন্তাপ জন্মে এবং ধর্ম্ম দুর্লভ হয়।

১০। গুটিপোকা নিজ-শরীর-জাত সূত্র দ্বারা নিজেই স্ব-শরীরকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করে এবং পরে সেই বন্ধন ছেদন করিতে না পারিয়া তন্মধ্যেই দেহত্যাগ করে। মানবও কতকগুলি কাল্পনিক সম্পর্ক-জালে নিজকে বন্ধন করে এবং পরিশেষে সেই বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু-কারাগারে উপস্থিত হয়।

১১। বিষয়ই বৈতরণীনদী, মুমুক্ষু সাধক প্রযত্নসহকারে অবিলম্বে ইহার পরপারে গমন করিবেন।

১২। তুমি অনন্ত, সর্ব্বগত, মহান্। কিন্তু যখনই একটী ক্ষুদ্র বাসনা-বুদ্‌বুদ্ মনে উঠে, তখনই সাড়ে তিন হাত খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ হও!

১৩। কামনাশূন্য আমি শরীরে থাকিয়াও অশরীরী, মুক্ত, আনন্দময়, শান্তিময়। কামনাযুক্ত হইলেই শরীরী, বদ্ধ, ভীত, দুর্ব্বল ও দুঃখময়।

১৪। "আমি কর্ত্তা", "ইহাই আমার কর্ত্তব্য", "ইহা না করা অন্যায়"—এই বুদ্ধিই কর্ম্মের বীজ, ইহা হইতেই সংসার।

১৫। "হৃদয়-গ্রন্থি।" গ্রন্থি—হৃদয়ের, আত্মার নহে।

১৬। আমি কর্ত্তাও নহি, ভোক্তাও নহি। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম।

১৭। ছোট বড় যে কোন কর্ম্মই করিতে হয়, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই মনে করিতে হয়—"ইন্দ্রিয়া ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে", "নৈব কিঞ্চিৎ করোমি"।

১৮। আত্মা—নাম, রূপ ও ক্রিয়া হইতে ভিন্ন—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। আত্মার কোন কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নাই।

১৯। কাহারও কোন কর্ম্ম আত্মাকে তিলমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সর্ব্বদা একরূপ, নির্ব্বিকার, নিষ্কল, নিত্য ও অক্রিয়।

২০। আত্মা আকাশবৎ নির্লিপ্ত, অসঙ্গ, দ্রষ্টা ও নির্বিষয়।

২১। সুমধুর সঙ্গীত এবং প্রশংসার মনোমোহন-ধ্বনি; মিথ্যা, নিন্দা এবং কর্কশ ও অযৌক্তিক বচন; লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য এবং কুৎসিৎ ও বিকৃতাঙ্গ কলেবর—এসকল কিছুই

আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশে মুষ্টি-নিক্ষেপবৎ এ সকলে আত্মার কিছুই আসে যায় না। অবিবেকীই প্রিয় রূপ-রসাদি দ্বারা নিজকে মহীয়ান্ মনে করে, আবার অপ্রিয় বিষয় দ্বারা নিজকে দীন-হীন মনে করে।

২২। সংসারিগণ আত্মার সহিত বিষয়ের কতকগুলি কাল্পনিক সেতু প্রস্তুত করিয়া অহরহঃ তদুপরি বিচরণ করে ও তৎফলে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর অধীনতা প্রাপ্ত হয়।

২৩। বিচারই মুমুক্ষু ব্যক্তির পরম বন্ধু। বিচার শাস্ত্রানুকূল হওয়া চাই।

২৪। মুক্তি-লাভের জন্য যে চেষ্টা, তারই নাম পুরুষকার; অন্যান্য কর্ম্ম পশুচেষ্টা মাত্র।

ওঁ

১। এক যায়গায় এরূপ লেখা আছে ঃ—পরব্রহ্ম পরমশিব ত্রিপুর-বধ-বাসনায় সজ্জিত হইলেন। তাঁহার সেই অভিযানে—(অভিযানে, না অভিনয়ে ?)—সাহায্য করিবার নিমিত্ত দেবগণও প্রস্তুত হইলেন। দেবতাদিগের মধ্যে কেহ হইলেন রথ, কেহ ঘোড়া, কেহ বা সারথী ; কেহ হইলেন ধনু, কেহ শর, আর কেহ বা তূণীর ;— এইরূপে প্রত্যেক দেবতাই কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তখন হঠাৎ সেই দেবমণ্ডলীর ভিতরে, কেনোপনিষদের দেবগণের মত, "অহং"-ভাব প্রাদুর্ভূত হইল। পৃথিবী মনে করিলেন, 'আমি যদি রথ না হইতাম, তবে এই যে উদ্যোগ-আয়োজন,—সবই পণ্ড হইয়া যাইত।' ব্রহ্মার মনে হইল, 'ভাগ্যে আমি সারথী হইয়াছি ! নইলে দেখা যাইত—যুদ্ধটা কেমন চলে !" বিষ্ণু ভাবিলেন, 'আমি শর হইয়াছি বলিয়াই না ত্রিপুর-বধের আশা হইতেছে ? আমার শক্তির উপরই সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।' সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান শম্ভু দেবগণের এই অভিমানানন্দ তৎক্ষণাৎ জানিতে

পারিলেন ; জানিয়াই, একটি হাস্য করিলেন ; এবং কেবল সেই হাস্যেই—দেবগণের সামান্য সাহায্য ব্যতীতও—ত্রিপুরাসুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

২। মহারাষ্ট্রদেশে একজন সাধু ছিলেন ; নাম—জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস খুব ভক্ত ; মাঝে মাঝে তিনি ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া থাকেন। একদিন এক ভাণ্ডারায়* অন্যান্য সাধুর সহিত জ্ঞানদাসজীও পঙ্‌ক্তিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক মহাপুরুষ সেখানে উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট সাধুগণের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া, কোন কোন সাধুকে 'এ কাচ্চা', কোন কোন সাধুকে 'এ পাক্কা' বলিতে লাগিলেন। জ্ঞানদাসজীকে তিনি 'কাচ্চা'র দলে ফেলিলেন। জ্ঞানদাস দুঃখিত হইলেন ; ভাবিলেন, 'ভগবান কৃপা করিয়া মাঝে মাঝে আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন, তবুও আমি কাচ্চা !' সেই রাত্রেই যখন ভগবান আবির্ভূত হইলেন, তখন জ্ঞানদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর ! তোমার দর্শন পাইয়াও আমি কাচ্চা, আর যারা তোমার এ দিব্য-মূর্ত্তির দর্শন পায় নাই, তাদের মধ্যেও কেহ কেহ পাক্কা হইয়া গেল !" আরাধ্যদেব বলিলেন, "হাঁ জ্ঞানদাস ! তুমি কাচ্চা। অমুক স্থানে এক বৃদ্ধ ফকির আছেন, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে পাক্কা হইতে পারিবে।" কি অদ্ভুত

* ভাণ্ডারা—ভোজ, পঙ্‌ক্তি-ভোজন।

আদেশ! অনাচারী ম্লেচ্ছ মুসলমান্,—তার শিষ্য হইতে হইবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জ্ঞানদাস মন স্থির করিলেন এবং ধীর-পদ-বিক্ষেপে ফকির সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হরি! হরি! দেখিতে পাইলেন কি? একটি শিবলিঙ্গের উপরে পদদ্বয় স্থাপন করিয়া ফকির সাহেব অতি আরামের সহিত নদী-সৈকতে বালুকা-শয্যায় শায়িত আছেন। নিষ্ঠাবান ভক্ত জ্ঞানদাসের মন চঞ্চল হইল। ক্ষোভে, ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ ফকির স্নেহ-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "জ্ঞানদাস! কি ভাবিতেছ?" জ্ঞানদাস বলিলেন, "শিবলিঙ্গ ব্যতীত অপর কোনও স্থলে কি আপনি পা রাখিতে পারিতেন না?" বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার যেখানে খুসী, আমার পা দু'খানা রাখিয়া দাও।" জ্ঞানদাস পা দু'খানাকে লইয়া যেখানেই স্থাপন করেন, সেখানেই দেখিতে পান—পায়ের নীচে একটি শিবলিঙ্গ। জ্ঞানদাস ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া বৃদ্ধের পদ-প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল পরে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। [গল্প ত শুনিলে ;—এখন, কোন কোন মহাভারত-শ্রবণকারীর মত, তোমরাও দেবমূর্ত্তি দেখিলেই পদাঘাত করিতে যাইবে না কি?]

৩। ঐ অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে যে প্রদীপ

জ্বলিতেছে, তাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ-শক্তি বহির্ভাগে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূত হইতেছে না। প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া দাও, দেখিবে—উহার আলো সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে! তেমনই, যখনই জীব মোহ-নির্ম্মুক্ত হইবে—যখনই তাহার অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হইবে, তখনই সে বুঝিবে, অনুভব করিবে—তাহার অস্তিত্ব এবং তাহার (ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া) শক্তি সর্ব্বগত এবং সনাতন।

৪। মন যদি ভগবৎ-পদারবিন্দে লিপ্ত না হয়, তবে ৮৪ প্রকার আসনের অভ্যাসেই বা লাভ কি, রাশি রাশি শাস্ত্র-গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াই বা ফল কি, সারাদিন ধরিয়া তার স্বরে স্তোত্র পাঠেই বা উপকার কি, আর উপবাসাদি-ক্লেশ-সহনেরই বা সার্থকতা কি?

৫। আসন-প্রাণায়ামই কর আর শাস্ত্র-চর্চ্চাই কর, জপ-পূজাই কর আর চান্দ্রায়ণাদিই কর, সর্ব্বদা লক্ষ্য স্থির থাকা চাই,—যেন এগুলিতে মন স্থির করে, ভক্তি বর্দ্ধিত করে, জীবন ধন্য করে। নতুবা অন্যবিধ অপকার ও অসুবিধা ঘটাইবার সহিত ইহারা তোমার অভিমানের বোঝা আরও বাড়াইবে মাত্র।

৬। একটি মাত্র উপদেশের সম্যক্ পালনেই জীবন

উন্নত ও ধন্য হইতে পারে। একটি মাত্র শব্দের উচ্চারণেই মন ভাব-রসে নিমজ্জিত হইতে পারে।

৭। আদর্শটি নির্দ্দোষ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া চাই। যদি সে'টিকে সম্যক্ প্রকারে অনুসরণ করিতে না-ও পার, যতদূর সাধ্য ততদূরই করিও;—কদাপি আদর্শকে ছোট করিও না।

৮। বেশ লইবে ত্যাগীর মত, আর কর্ম্ম করিবে ভোগীর মত,—এ ভাল নয়।

৯। আমাদের বৃদ্ধ-প্রতিবেশী নারায়ণের কথা মনে কর। বোধ হয় মনে আছে, সে এক সময়ে তোমার মিত্র (তুমি তাহাকে মিত্র মনে করিতে) ও আমার শত্রু (আমি তাহাকে শত্রু মনে করিতাম) ছিল। তাহার নিকট হইতে তুমি আশা করিতে স্নেহ ও সহানুভূতি, আমি আশা করিতাম শত্রুতা ও অপকার। তাহার মধ্যে তুমি দেখিতে বদান্যতা, আমি দেখিতাম যশোলিপ্সা। তুমি বলিতে—"লোকটা কি ধার্ম্মিক!" আমি বলিতাম—"লোকটা কি কপট!" তাহার রূপ দেখিলে, তাহার কণ্ঠ-স্বর শুনিলে, সে কাছে ঘেঁষিলে—তোমার হইত আহ্লাদ, আর আমার হইত ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তার নাম মনে পড়িলে—তোমার

সাম্‌নে হাজির হইত একখানা 'মধুর মূর্ত্তি', আর আমার সাম্‌নে দেখিতাম একখানা 'বিকট চেহারা'। সে ত লোক একজনই—এক নারায়ণই, তথাপি তোমার ও আমার মনে তার ছবি সম্পূর্ণ পৃথক্; এক নারায়ণেরই ছবি দুই মনের উপর দুই রকম, বিভিন্ন মনের উপর বিভিন্ন রকমের।

১০। লিখিবার উপকরণ—কলম, কালী, কাগজ প্রভৃতি ভাল না হইলে লেখায় সুবিধা হয় না। সাধনের উপকরণগুলিও ভাল হওয়া চাই। নতুবা, সাধনে সুবিধা হয় না।

১১। যে কাজের ভার বা দায়ীত্ব গ্রহণ করিবে, তাহার সুসম্পাদনের জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করা চাই।

কর্ণবাস।

ওঁ

১। চারি প্রকার শ্রদ্ধা চাই—(১) ভগবানের উপর, (২) গুরুর উপর, (৩) বেদের উপর ও (৪) নিজের উপর।

২। যত আসক্তি,—তত চাঞ্চল্য, তত অশান্তি।

৩। বৈরাগ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ধ্যান-নিষ্ঠ হওয়া যায় না।

৪। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি বিবেচক ও কর্ম্ম-কুশল। কুটীর-নির্ম্মাণের উপযোগী স্থান নির্দ্ধারিত কর।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমি ত বরাবরই আপনার দাস। আমার কোনরূপ স্বাতন্ত্র্যই নাই। আমার ভাল মন্দ সকলই আপনি। আপনাকে ছাড়িয়া অন্য কোনরূপ বিচার আমার আসে না। আপনিই স্থান নির্দ্ধারণ করুন। আপনি যে স্থান পছন্দ করিবেন, সেই স্থানই আমার ভাল লাগিবে।" রাম সন্তুষ্ট হইয়া স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রামময়-প্রাণ লক্ষ্মণ কুটীর

নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। দেবতারা ভীলরূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের সহায় হইলেন। অবিলম্বে সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় আশ্রম প্রস্তুত হইল। লক্ষ্মণ রামের প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

৫। যখনই তপস্যার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সে বিঘ্নের মধ্যেও যথা-সম্ভব শান্ত মনে ভগবানকে দর্শন করিতে অভ্যাস কর। ধৈর্য্য-হীন হইও না। এখন সামান্য অন্তরায়ই যদি তোমার মনকে অস্থির করে, ভগবানকে ভুলাইয়া দেয়, তবে শেষ মুহূর্ত্তে—মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে—তাঁকে মনে রাখিবে কিরূপে ?

৬। তন্ময় হইলে তিনিই যোগ-ক্ষেম বহন করিবেন ; —তবে আর চিন্তা কি ? তবে, 'তিনি যোগ-ক্ষেম বহন করিবেন'—এ আশা লইয়া সাধন করিতে বসা মন্দের ভাল মাত্র। 'যা হয় হউক্, সাধন করিব'—এই চাই।

৭। চিত্ত অনেকটা শুদ্ধ হইলে জ্ঞানাভাস আসে, তৎপর পর-বৈরাগ্য, তৎপর শান্তি।

৮। কতকটা বলা যায় না, আর কতকটা বলা উচিত না।

৯। কোন রূপের উপর স্নেহ, কোন রূপের উপর বিদ্বেষ, কোন রূপের উপর ভয়,—এরূপ হইলে, বিশ্ব-মূর্ত্তি পূর্ণ-ব্রহ্মকে পাওয়া যায় কিরূপে ?

১০। উপযুক্ত দানই প্রকৃত সঞ্চয়।

১১। সকলেরই সকল নাম।

১২। অতীতের অনন্ত জন্মে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য বিষয়-সেবা করিয়াছি, এবারও ত এত দিন করা গেল। কিন্তু তা'তে ফল হইল কি ? একবার বরং অন্য চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্ না ?

১৩। আসক্তিই বুদ্ধির মল।

১৪। উপায়—শাস্ত্র-সম্মত হওয়া চাই। উদ্দেশ্য—সর্ব্বদা মনে থাকা চাই।

১৫। ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে চারি প্রকার কৃপার প্রয়োজন ;—(১) ঈশ্বর-কৃপা, (২) গুরু-কৃপা, (৩) বেদ-কৃপা ও (৪) আত্ম-কৃপা।

১৬। সন্ন্যাস মানে কি?—ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন।

১৭। আচার্য্য যদি কেবল শিষ্যের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেই তৎপর হন, তবে শিষ্যের কুশল হয় না।

১৮। সৃষ্টি দুই প্রকার,—ঈশ্বর-সৃষ্টি ও জীব-সৃষ্টি। ঈশ্বর-সৃষ্টিতে কোন হানি নাই; জীব-সৃষ্টিই বন্ধনের কারণ।

১৯। এক জোড়া প্রেমের চশ্‌মা যদি পাও ত একবার পরিয়া দেখ—'জড় বালুকণা এবং প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেও কত জীবন, কত লীলা! তারা তোমার দিকে চাহিয়া কত হাসিবে—কত খেলিবে—কত বলিবে—কত শিখাইবে—কত রহস্যের গুপ্ত-দ্বার উদ্ঘাটিত করিবে!'

২০। প্রভুত্বেও কত অধীনতা! হাতী চালাইতে হইলেও বাধ্য হইয়া মাহুতগিরি করিতে হয়!

২১। দারিদ্র্যের অন্ত কোথায়? তুমি কাহারও নিকটে যশের প্রার্থী, কাহারও নিকটে অর্থের ভিখারী,

কারও সহাস্য বদন দেখিবার জন্য লালায়িত। অনেকের নিকটেই ব্যবহার-বিশেষ পাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র। ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র, প্রভু-ভৃত্য, ভাই-ভগ্নি, পিতা-পুত্র সকলেরই নিকটে কিছু-না-কিছু আশা করিতেছ! হায় মানব!

২২। কি বিড়ম্বনা! দীনাতিদীন, মূর্খের একশেষ, তৃণাদপি নগণ্য, সমাজের ঘৃণিত এক রাস্তার-বালকও নিন্দা দ্বারা তোমাকে কষ্ট প্রদান করিতে, প্রশংসা দ্বারা তোমাকে সুখ দান করিতে এবং ব্যবহার-বিশেষ দ্বারা তোমার অন্যবিধ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটাইতে সর্ব্বদাই সমর্থ! তুমি তদ্দত্ত দুঃখের অধীন, তার দ্বারে সুখের কাঙ্গাল, তার ভয়ে তুমি ভীত! তোমার আবার স্বাধীনতা! তোমার আবার ঐশ্বর্য্য! তোমার আবার প্রভুত্ব!

২৩। রামের প্রয়োজন সত্ত্বেও সে এক ফোঁটা দুধ খেতে পায় না; আর তুমি তার ঐ প্রয়োজন এবং অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করিয়া, তার ও তোমার বন্ধু শ্যামের জন্য দুগ্ধ-বহনে তা'কে অনুরোধ করিলে। এ কি ভাল?

২৪। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লুকাইয়া আছেন; আর দুর্ব্বল মানুষ চায় সর্ব্বদা নিজকে যথা ও অযথা রূপে প্রকাশ করিতে!

২৫। বাসনার মূল সঙ্কল্প। সঙ্কল্প-পরিত্যাগে বাসনার ক্ষয় হয়। বিষয়ের আলোচনা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।

২৬। স্থিতিকে আশ্রয় না করিয়া গতি থাকিতে পারে না। শিবকে আশ্রয় করিয়া কালী নৃত্য করিতেছেন।

২৭। অজ্ঞানও এক প্রকারের জ্ঞান। আবার অন্য পক্ষে, জ্ঞানও এক প্রকারের অজ্ঞান।

২৮। এক ঈশ্বরেচ্ছাই এবং এক ব্রহ্মানন্দই বিভিন্ন কোশের ভিতর দিয়া বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়।

২৯। * * * *

স্বর্গাশ্রম।

ওঁ

১। ডাক্তারখানায় কত ঔষধ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি ঔষধই সকলের জন্য নয়। শাস্ত্র-ভাণ্ডারেও হাজার হাজার উপদেশ আছে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই প্রত্যেকের জন্য নয়। ঔষধ উপযুক্ত না হইলে, উপশম ত দূরের কথা, রোগের বৃদ্ধিও অসম্ভব নয়।

২। যদি আম-বাগানেই আসিয়াছ, তবে আম খাওয়ার পরিবর্ত্তে (কেবল) পত্র-গণনায়ই সময় পাত করিও না। যদি গীতা পড়িতেই বসিয়াছ, তবে তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণের পরিবর্ত্তে, গীতাকারের কবিত্বের আলোচনায়(ই) মনোনিবেশ করিও না। যদি সংকীর্ত্তন শুনিতেই বসিয়াছ, তবে ভগবানের নাম ও মহিমায় অমনোযোগী হইয়া, তাল-মানের শুদ্ধাশুদ্ধতার নিরূপণে(ই) ব্যস্ত হইও না।

৩। প্রত্যেক দ্রব্য, প্রত্যেক শক্তি ও প্রত্যেক সময়েরই সর্ব্বোত্তম ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। সময়-নিষ্ঠা ও নিয়ম-নিষ্ঠা সচ্চরিত্রতার প্রধান অঙ্গ

৫। যতটুকু সম্ভব, ততটুকু মন এবং ততটুকু সময়ই বর্ত্তমানে সাধন-ভজনে লাগাও ; বাকী মন ও বাকী সময়-টুকুর এমন ব্যবহার কর, যাহার ফলে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ মন ও সম্পূর্ণ সময়ই ভগবানে লাগাইতে সমর্থ হইবে।

৬। সাধনের জন্য একটি ভাব, তা যা'ই হোক্, ধরিয়া থাকা চাই। 'কখনও এটি, কখনও ওটি'—এরূপ হইলে সুবিধা হয় না।

৭। যখন সাংসারিক কর্ম্ম করিতে হয়, তখন পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিও—কর্ম্মটি তোমার সাধনের 'ভাব'টিকে গ্রাস করিতেছে কি না, কর্ম্ম-স্রোতের টানে ভগবানকে বিস্মৃত হইতেছ কি না, এবং সাধনের পরিপন্থী কোন ভাব তোমার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে কি না। যদি সতর্ক থাক, তবে, অভ্যাসের ফলে, কর্ম্মের সময়েও সাধনের ভাব বজায় থাকিবে এবং ভগবচ্চিন্তা চলিবে।

৮। বাসনা, সংস্কার—এগুলি আর কি?—মনের বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন মাত্র। অভ্যাস দ্বারা এগুলি

দৃঢ়-মূল হইয়াছে। অভ্যাসে যাহার জন্ম, অভ্যাসে তাহার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। ঐ স্পন্দনগুলি রোধ কর, বিরুদ্ধ স্পন্দনের অভ্যাস কর, কালক্রমে বাসনা ও সংস্কার দূর হইবেই।

৯। যখনই 'আমি'—এই শব্দ মনে উদিত হয়, অমনি ভাবিবে, 'আমি মানে দেহ নয়, আমি মানে আত্মা, আমি ব্রহ্ম।'

১০। সকল শরীরই ত আমার, সকল শরীরেই আমি; তবে কে আমাকে ঠকায়, কে আমার শত্রু, কে আমাকে নিন্দা করে?

১১। আমি ভিন্ন আর কে আছে?—আমিই আমার প্রশংসা করি, আমিই আমার নিন্দা করি। তবে আর প্রশংসা ও নিন্দার জন্য সুখ-দুঃখ কি?

১২। আমি বরাবর আছি, বরাবর থাকিব। আমার আবার জন্ম, মৃত্যু কোথায়?

১৩। আমাকে আশ্রয় করিয়া—আমার ভিতরে অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতেছে, গ্রহ-নক্ষত্র চলিতেছে,

বায়ু বহিতেছে, পাতা নড়িতেছে, এই শরীর ও অন্যান্য শরীর (সমুদয় জীব-জন্তু) বিচরণ করিতেছে, এই মন ও অন্যান্য সকল মন স্পন্দিত হইতেছে। ইহাতে—এই সকল কম্পনে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিকার, ধীর, স্থির, শান্ত, উদাসীন, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। "নৈব কিঞ্চিৎ করোমি।"

১৪।. সকলই ব্রহ্ম। ভোক্তা, ভোজ্য ও ভোগ; জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন; কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া;—এ সকলই ব্রহ্ম। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—প্রত্যেকেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। যা কিছু সকলই ব্রহ্ম। তবে আর ভাল-মন্দ কি? বন্ধন-মুক্তি কি? ত্যাজ্য-গ্রাহ্য কি?

১৫। 'দু-টি' ত কোথায়ও নাই। আমি ও তুমি, আমার ও অন্যের—এ সকলই ত ফাঁকি!

১৬। অংশহীন, সর্ব্বব্যাপী মাত্র এক সত্তাই বর্ত্তমান। তবে আর 'আমি পরোপকার করিতেছি'—এরূপ অহঙ্কারের স্থান কোথায়?

১৭। আমি ত শরীর নই;—তবে আর শরীরের কর্ম্মে আমার অভিমান হইবে কেন?

১৮। নিজকে কেন আমি 'সাড়ে তিন হাত' গণ্ডির মধ্যে শুধু-শুধু আবদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা ও বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় প্রদান করিব?

১৯। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান্,—ইতি শান্ত উপাসীত"।

২০। "এই কর দেব দীন-দয়াময়!
তোমায় আমায় যেন ভেদ নাহি রয়;
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়,
চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর!"

২১। আমি যে অচল, অটল, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম;—আমার আবার যাওয়া-আসা কি? আমার কর্ম্মই বা কি?

২২। আমি ভিন্ন যে আর কিছুই নাই,—আমার আবার বাসনা কি?

২৩। এক ব্রহ্মই আছেন। যা কিছু সকলই ব্রহ্ম। আমিও ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্মই।

২৪। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ;—কার তরে ক্রন্দন, কার জন্য প্রফুল্লতা, কার নিমিত্ত ভাবনা, আর কিসের জন্যই বা ছুটাছুটি ?

২৫। "আমি শরীর" ও "এই শরীরটিই আমার" এই দুই মিথ্যাজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই সমুদয় লোক-ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

২৬। লোক-ব্যবহারের সময়ে মনে থাকা চাই—'এ সকল অভিনয় মাত্র। আমি সঙ্গহীন সর্ব্বগত ব্রহ্ম।' অভ্যাসের ফলে এরূপ স্মৃতি লাভ হয়।

২৭। যখন মনে কোন বিষয়-বাসনা উদিত হয়, তখন সেই বাসনা—সেই স্পন্দনের মধ্যে ব্রহ্ম-দর্শন করিবে। ঐরূপ ব্রহ্ম-দর্শন ও ব্রহ্ম-স্মরণের ফলে বাসনা অন্তর্হিত হইবে।

২৮। "আমি ব্রহ্ম"—আমার আবার সাধন কি, সমাধি কি, সিদ্ধিই বা কি, আর মুক্তিই বা কি ?

২৯। যতক্ষণ অনুমান, ততক্ষণই বিচার। জ্ঞান হইলেই বিচার বন্ধ।

৩০। ২৪ ঘণ্টাকে তিন ভাগ করিয়া—এক ভাগ আহার নিদ্রায়, এক ভাগ বিষয়-কর্ম্মে ও এক ভাগ সাধন-ভজনে ব্যয় করিবে। ক্রমে সাধন-ভজনে যতই মন লাগিতে থাকিবে, ততই অন্য দুই ভাগ হইতে সময় কাটিয়া লইয়া ভজনের সময় বাড়াইতে থাকিবে।

৩১। তুমি হাজার চেষ্টাই কর, জগতের বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্বও ভগবান তোমার হাতে ছাড়িয়া দিবেন না। তবে আর জগৎ লইয়া মাথা ঘামান কেন? এস, জগতের সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমরা আত্মচিন্তায় রত হই।

৩২। যদিও আমরা দুর্ব্বল, যদিও আমাদের বাধা বিঘ্ন অনন্ত, তথাপি হতাশ হইবার কারণ নাই। চড়ুই পাখীর সমুদ্র-শোষণের গল্প জান তো? এস, আমরাও, চড়ুই পাখীর মত, আমাদিগের সুযোগ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করিতে যথাসাধ্য যত্ন করি; চড়ুই পাখীর মত, আমরাও, ভগবানের কৃপায়, নিশ্চয়ই সফলকাম হইব।

৩৩। মানুষটী যেমনই হউক্,—তার ভিতরে দেবত্ব দেখিলে তোমারই লাভ, আর তার ভিতরে পশুত্ব দেখিলে তোমারই ক্ষতি। তোমার যেমন ভাব, তেমন লাভ।

বিষয়ের ভিতরে যদি ভগবানকে দর্শন করিতে পার, তবে বিষয়ের বিষয়ত্ব দূর হইয়া যাইবে।

৩৪। তোমা অপেক্ষা বড়ই বা কে, আর তোমা অপেক্ষা ছোটই বা কে?

৩৫। গীতা বলেন,—"অনন্যা ভক্তি" ব্যতীত ভগবান লাভ হয় না।

৩৬। সাধনের সময়ে যে সকল বিঘ্ন আসে, তজ্জন্য উদ্বিগ্ন বা হতাশ হইও না। শান্ত মনে সাধনে লাগিয়া থাক। ভগবানই সে সকল বিঘ্ন দূর করিবেন।

৩৭। তোমার ইচ্ছামত সকল কাজ না হইলেই বিরক্ত হইও না।

৩৮। অন্য কর্ম্ম ছাড়িয়া আগে আসল কাজটি শেষ করিয়া লও। শেষে যদি সময় না পাও?

৩৯। জন্মও একাকী, মৃত্যুও একাকী, ধর্ম্ম-লাভও একাকী।

আশ্বিন, শুক্লা ত্রয়োদশী, ১৩২৩।

ওঁ

১। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কৃষ্ণ! আমাদের সমুদয় শত্রুই ত ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজ্য এখন নিষ্কণ্টক। কোথায়ও অশান্তির লেশমাত্র বিদ্যমান নাই।" বাসুদেব বলিলেন, "নরনাথ! কয়েকজন দুর্ব্বল শত্রুকে পরাস্ত করিয়াই অতিমাত্র আশ্বস্ত হইবেন না। আপনার এক মহাশত্রু এখনও জীবিত; কেবল জীবিতই নহে,—সে আপনারই রাজ্যে থাকিয়া, আপনারই অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, ক্রমেই অধিকতর বলসম্পন্ন হইতেছে! সে মহাশত্রু জীবিত থাকিতে আপনার শান্তি-লাভের সম্ভাবনা কোথায়?" ত্রস্ত এবং বিস্মিত হইয়া ধর্ম্ম-নন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল কি কৃষ্ণ! এমন শত্রুর কোন সন্ধানই ত এত দিন জানিতে পারি নাই! তাহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবিলম্বেই বর্ণন কর।" ভগবান বলিলেন, "মহারাজ! সে শত্রু আপনারই দেহ-দুর্গে বর্দ্ধিত হইতেছে। তার নাম—'অভিমান'। সে যত দিন অপরাজেয় থাকিবে, তত দিন অশান্তি আপনাকে পরিত্যাগ করিবে না।"

২। বাহ্লিক দেশে এক রাজা ছিলেন। কালক্রমে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল। তিনি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অতি দূরে এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। সাধু রাজার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহাকে আশ্রম-কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। রাজাকে প্রত্যহই এক পাহাড়ে উঠিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে এবং কাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া আশ্রমে পহুঁছাইতে হইত। এরূপ কর্ম্মে অনভ্যস্ত হইলেও, রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের সহিত যথাসম্ভব সুচারু রূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন কাষ্ঠের বোঝা বাঁধিতে সামান্য একটু ত্রুটি হওয়ার জন্য আশ্রমের একজন নীচকুলোদ্ভব চাকর রাজার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিল। রাজা তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিলেন না। "আজ যদি আমি বাহ্লিক দেশে থাকিতাম, তবে লোকটা বুঝিতে পারিত—এই চপেটাঘাতের মূল্য কত"—মৃদুস্বরে এইমাত্র বলিয়াই এক স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনোমধ্যে দুঃখের উদয় হইল। তিনি উঠিয়া সাধুজীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং প্রণামাদি সমাপনান্তে বলিলেন, "ভগবন্! আপনার শিষ্য হইবার আশায় কত কাল এই আশ্রমে অতিবাহিত করিলাম! আমার পরে কত লোক আসিল, তাহাদের মধ্যেও

অনেকের দীক্ষা হইয়া গেল; কিন্তু আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল না!" সাধু উত্তর করিলেন, "এখনও বিলম্ব আছে। এখনও তোমার গায়ে বাহ্লিকের গন্ধ বিদ্যমান।"

৺কামাখ্যাধাম;

৪ঠা ফাল্‌গুন, ১৩২৫।

ওঁ
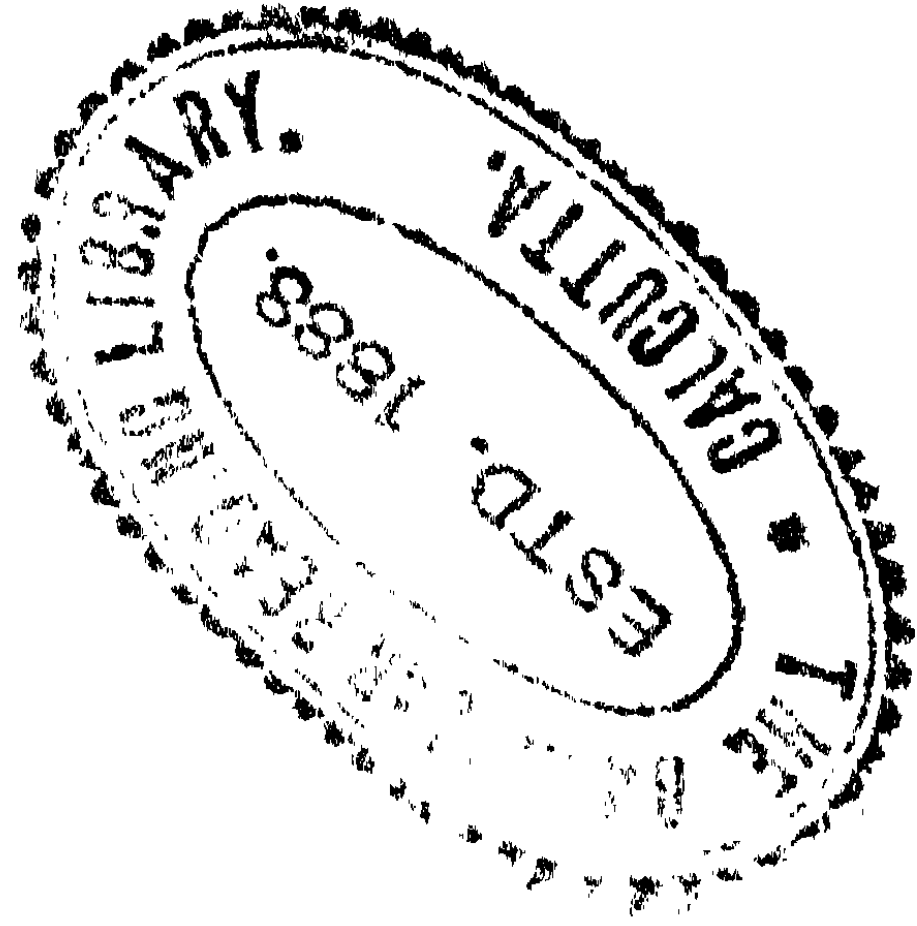
১। মহামুনি বেদব্যাস ভগবান পিনাক-পাণির সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রণামাদি সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "জগদ্‌গুরো! শ্রীমান শুকের উপনয়-নের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। আমার প্রার্থনা, আপনি অনুকম্পা পুরঃসর তাহাকে এ সময়ে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন।" শঙ্কর বলিলেন, "ব্যাস! আমার নিকটে পরব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে সে কি আর তোমার সঙ্গে থাকিয়া গৃহস্থ-জীবন যাপন করিবে?—সে যে তখনই জ্ঞান লাভ করিয়া, নিঃসঙ্গ-চিত্তে যথা তথা বিচরণ করিতে থাকিবে।" ব্যাসদেব উত্তর করিলেন, "ভগবন্‌! সংসার-পাশ-বিমোচক আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, মৎপুত্র যে অবিলম্বেই সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? তবে, সে গৃহেই থাকুক্‌ কিম্বা পরিব্রাজকই হউক্‌, সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব;—তাহার উপনয়নের জন্য শ্রেষ্ঠতম-আচার্য্য-নিয়োগের চেষ্টা করিব। ফল কি হইবে, সে চিন্তা করিব

না। তাই, মিনতি করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া শ্রীমানকে উপদেশ প্রদান করুন।"

২। কীর্ত্তন-পীযূষ সমুদয় দিকে পরিবেষণ করিতে করিতে প্রেমৈক-সম্বল নারদ যখন নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলেন, তখন শৌনকাদি তপোনিষ্ঠ মুনিগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সোৎসাহে তাঁহার পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্ম-পুত্র! অধুনা কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন করিতেছেন?" দেবর্ষি উত্তর করিলেন, "যাঁহার বরণীয় কীর্ত্তি ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, সেই সার্থক-জন্মা পরীক্ষিত-নরপতির নিকট হইতেই আসিতেছি।" শৌনক বিনীত বচনে কহিলেন, "ভগবন্! ভবদীয় মুখারবিন্দ যাঁহার প্রশংসা-সৌরভ প্রচার করিতেছে, তিনি ভাগ্যবান পুরুষ, সন্দেহ নাই। তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে আমাদিগের আগ্রহ জন্মিতেছে। যদি তাঁহার বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের অলৌকিক মহিমা কীর্ত্তিত হয়, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিয়া আমাদিগের কর্ণকুহর পবিত্র করুন। কিন্তু যদি তাঁহার জীবন-কথনে হরি-গুণ-কীর্ত্তন না হয়, তবে সে উপাখ্যানে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য আলোচনা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি।"

৩। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য একান্ত-তপস্যার নিমিত্ত কোন নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, গৃহস্থিত যাবতীয় তৈজস-পত্র ভার্য্যাদ্বয়ের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে-ছেন, এমন সময়ে দ্বিতীয়া পত্নী মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্! সসাগরা বসুন্ধরা যদি বিত্তপূর্ণা হইয়া আমার উপভোগ্যা হয়, তবে কি তৎসাহায্যে আমি অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না। অনিত্য পদার্থের দ্বারা নিত্যবস্তু—অমৃতত্ব লাভ করা যায় না।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা আমাকে অমরত্ব প্রদান করিতে পারে না, এমন দ্রব্যে আমার কি প্রয়োজন? আমি ঐ সকল মোহ-ভাণ্ড চাই না। যাহার সাহায্যে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব, এমন কিছু আমাকে প্রদান করুন।" যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক সহর্ষে বলিলেন, "মৈত্রেয়ি! তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করি-তেছি। মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হও। অচিরেই অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে।"

৪। তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার কালে শাক্য-সিংহ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "তপস্যা করিতে করিতে এ শরীর যদি শুষ্ক হইয়া যায়, অস্থি-চর্ম্ম-মাংস যদি প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি বিজ্ঞানামৃত লাভ করিবার পূর্ব্বে—কিছুতেই তপস্যা পরিত্যাগ করিব না।"

৫। তপস্যা-নিরত ঈশার সমক্ষে যখন কামদেব মনোমোহন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সমুদয় কাম্য বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেন, ঈশা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, **"Get thee hence, Satan, I do not want thee."**

৬। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, "এই তিমিরাতীত, জ্যোতির্ম্ময়, মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি। কেবল ইহাঁকে জানিয়াই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অমরত্ব (মুক্তি)-লাভের অন্য পন্থা বিদ্যমান নাই।"

আজকার চিঠি এই খানেই শেষ করিয়া, এস, ঐ সম্মুখাগত মহাত্মার পাদ-পদ্মে প্রণত হই। ঐ যে প্রসন্ন-মূর্ত্তি পরিব্রাজক ধীরপদে আগমন করিতেছেন, উহাঁকে চিনিতে পারিয়াছ কি?—উহাঁরই নাম শ্রী-শুকদেব; জ্ঞান-সিন্ধু শঙ্করের উপদেশে প্রবুদ্ধ হইয়াই, তদবধি, ব্রহ্মামৃত-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে—প্রতিপদক্ষেপে ধরণীর পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিতে করিতে এই প্রপঞ্চ-পরাঙ্মুখ, জ্ঞানতৃপ্ত মহাপুরুষ নির্ব্বিকার চিত্তে, সর্ব্বত্র সমভাবে বিচরণ করিতেছেন। এরূপ দুর্লভ সঙ্গ, এরূপ মহীয়ান্ আদর্শ আর কোথায় মিলিবে? অতএব,

আর সময়-ক্ষেপে প্রয়োজন নাই। চল, আমরা অবিলম্বেই এই অখণ্ডানন্দ-বিগ্রহের অনুগমন করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি।

৺ কাশীধাম ;

৪ঠা পৌষ, ১৩২৫।

তৃতীয় অনুবাক্ ।

ওঁ

নারায়ণেষু।

যখন ভাল-মন্দ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত,—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, উন্নতি-লাভের কত সুযোগই হেলায় হারাইয়াছি! এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি করিতাম, আজ অশান্তির দাবানলে দগ্ধ হইতাম না!

সাধনার সুযোগ

কিন্তু অনুশোচনায় ফল কি? যা হইবার, তা হইয়াছে। অতীতের দুর্ব্বুদ্ধির কুফল আমাকে বর্ত্তমানে সাবধান করুক্। আত্মোন্নতির যে সকল সুযোগ এখন আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে আসিবে, তাহাদিগকে যেন সাদরে গ্রহণ করিতে সক্ষম হই।

যে দিন যায়, সে দিন আর ফিরিয়া আসে না; যে সুযোগ এখন চলিয়া যাইতেছে, সে সুযোগ আর ফিরিয়া পাইব কি না, কে জানে? তাই, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিব, জাগিয়া থাকিব, দুয়ার খুলিয়া রাখিব,—যেন সুযোগরূপী প্রেমময়ের-কোন-অগ্রদূত দুয়ারে আসিয়া, দুয়ার হইতেই ফিরিয়া না যায়!

আচ্ছা, এখনই যে আমার সম্মুখে সাধনার অনন্ত

সুযোগ উপস্থিত রহিয়াছে! এগুলিকে পরিত্যাগ করিব কেন?

আমার জিহ্বা তো আড়ষ্ট হয় নাই, তবে এখনই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিব না কেন? আমার কর্ণ তো বধির হয় নাই, তবে এখনই প্রেমময়ের মহিমা শ্রবণ করিব না কেন? আমার চক্ষু তো অন্ধ হয় নাই, তবে এখনই দীনবন্ধুর সন্তাপহারী মূর্ত্তি দর্শন করিব না কেন? আমার হস্ত তো অবশ হয় নাই, তবে এখনই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত রহিব না কেন? আমার চরণ তো চলচ্ছক্তি হারায় নাই, তবে এখনই পুণ্য-স্থানে গমন করিব না কেন? আমার মন তো চিন্তা করিতে অসমর্থ হয় নাই, তবে এখনই ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইব না কেন?

প্রেম ও ব্যাকুলতা কোন বিঘ্নই মানে না

আমাদের প্রতিবাসী ঐ যে বিলাস-পরায়ণ বৃদ্ধ, উহাঁর কথাই একবার চিন্তা করি। উহাঁর ধন-জনের অভাব নাই। শিবিকারোহণ ব্যতীত সামান্য দূরেও উনি গমন করেন না। বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুশোভিত না হইয়া উনি বাটীর বাহির হ'ন না। কখন কিসে মান কমিয়া যায়, এই চিন্তায় উনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই ত উহাঁর সাধারণ অবস্থা। কিন্তু, যেদিন উহাঁর একমাত্র পুত্র সর্প-দংশনে মৃতপ্রায় হইল, সে দিন উহাঁর অবস্থা অন্য প্রকার। নগ্নপদে, অনাবৃতশরীরে ছুটিয়া চলিয়াছেন; সঙ্গে লোক-জন কেহই নাই; ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক

মুচির গৃহে উপনীত হইলেন। সর্প-দংশনের চিকিৎসায় মুচির নাম-যশ ছিল; অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সেই মুচিকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। এই যে এতটা ব্যাপার ঘটিল, ইতিমধ্যে—বৃদ্ধ মান-মর্য্যাদার চিন্তা একবারও করেন নাই; রাস্তার লোকে কে কি বলে, সে কথা একবারও ভাবেন নাই; অত দূর চলিতে পারিবেন কিনা, সে সন্দেহে একবারও চিন্তিত হ'ন নাই; সঙ্গে কাহাকেও লইবার বাসনাও করেন নাই; চরণতল যখন ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, তখনও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই!

কাল-দষ্ট আমিও যখন ভব-রোগ-বিনাশক বৈদ্যরাজের সন্ধানে ছুটিতেছি, তখন—মান-অপমানের চিন্তা করিব কেন, সুখ-দুঃখের বিচার করিব কেন, যন্ত্রণার দিকে মন যাইবে কেন, অন্যের অপেক্ষা করিব কেন, অন্য কিছু ভাবিব কেন?

অন্য দিকে মন দিবার অবসর আমার নাই। এই খানেই চিঠি বন্ধ করিয়া, এই মুহূর্ত্তেই, তন্ময় চিত্তে, প্রেম-ময়ের কাছে ছুটিয়া যাই!

৺কাশীধাম;
১১ই পৌষ, ১৩১৫।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি ; উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। পত্র পাইয়াই উত্তর দেওয়া—আজ-কাল সময়ে সময়ে ঘটিয়া উঠে না।

ভক্তের সাধন

ধ্যান-জপ যেরূপ ভাবে করিতে বলিয়াছি, সেই রূপেই করিতে থাক। বর্ত্তমানে কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখি না। 'সহস্র-নাম' অর্থ-বুঝিয়া পড়িতে পারিলে ত ভালই হয়, কিন্তু তাহা বোধ হয় তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই, অর্থ বুঝিতে না পারিলেও যথাসম্ভব ভক্তির সহিত নামাবলি পাঠ করিও ; তাতেও অনেক উপকার হইবে। পুষ্প-চন্দনাদির সাহায্যে মৃন্ময়ী ও প্রস্তরময়ী দেব-মূর্ত্তির বাহ্যপূজা যেমন লোকে করিয়া থাকে, তুমিও তদ্রূপ মানস-কল্পিত পুষ্প-চন্দনাদির সাহায্যে হৃদয়-সিংহাসনোপরিস্থিতা জ্যোতির্ম্ময়ী ইষ্ট-মূর্ত্তির মানস-পূজা প্রেমার্দ্র-হৃদয়ে সম্পন্ন করিবে। যে যে বস্তু দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করিতে ইচ্ছা হয়, তৎসমুদয়ই তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিবে। প্রত্যেক দ্রব্যটী অর্পণের সময়েই তোমার মন্ত্রটী একবার বলিবে।

হৃদয়ের দেবতাকে জাগ্রত, জীবন্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবে। তাঁহার সহিত কথা বলিবে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে, তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে, তাঁহাকে সাজাইয়া দিবে ও বারংবার প্রণাম করিবে। তাঁহার অনুমতি লইয়া, তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া, তাঁহারই প্রীতির জন্য, সমুদয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হইবে। তিনিই তোমার ইষ্ট, তিনিই তোমার গুরু, তিনিই তোমার আশ্রয়, তিনিই তোমার সহায়, তিনিই তোমার বন্ধু, তিনিই তোমার প্রিয়তম, তিনি তোমারই, তুমি তাঁরই। তুমি সর্ব্বদা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাক, তাঁহার উপরই নির্ভর কর। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার সর্ব্বদাই মানব-মনকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াসী। তুমি সাবধান থাকিও,—কখনও যেন এখানকার কিছুতেই আশা ও বিশ্বাস স্থাপন করিও না। মনে রাখিও এই নশ্বর জগৎ আমাদের চির-বাস-স্থান নয় ; যে অল্পকিছুকাল এখানে—এই পান্থশালায় থাকিতে হইবে, সেই সময়টুকুর মধ্যেই কৌশলপূর্ব্বক এমন কিছু করিয়া লইতে হইবে, যাহা আমাদিগকে চির-অমরত্ব প্রদান করিতে সমর্থ। তাই, একটু সময়ও হেলায় হারাইও না, একটু কালও অসতর্ক থাকিও না। সুযোগগুলি অনেক সময়েই আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া আবার আমাদের অজ্ঞাতসারেই পলায়ন করে। কখনও কখনও, তাহাদের

প্রস্থানের পরে তাহাদের সংবাদ পাইয়া, ২।৪ মিনিট কাল বৃথা অনুতাপ করি মাত্র। কাজেই, সাবধান থাকিও। বিচারের মশাল যেন কখনও নিভিয়া না যায়। কিন্তু, কেবল বিচারেও কুলাইবে না। সংসারের পিচ্ছিল পথে দুর্ব্বল মানবের জন্য প্রার্থনার যষ্টিখানিও বিশেষ আবশ্যক। যখনই শক্তির অল্পতা বোধ করিবে, সন্দেহ ও অবিশ্বাস আক্রমণ করিবে, দুর্ব্বলতার যন্ত্রণা অনুভূত হইবে, তখনই যুক্তকরে ও ঊর্দ্ধনেত্রে প্রার্থনা করিও, মায়ের নিকটে কাঁদিতে কাঁদিতে আব্দার করিও ; দেখিবে—মেঘমালা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে, প্রাণে শান্তির বাতাস বহিতেছে, অভয়দায়িনী বিশ্ব-জননীর কোলে তুমি স্থান পাইয়াছ। মনে রাখিও, প্রার্থনা অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ ; মায়ের কোষাগারে এমন কোন সিন্দুক নাই, যাহা প্রার্থনার চাবিতে খোলা যায় না। তাই বলিয়া কিন্তু মায়ের কাছে যা-তা চাহিতে হইবে না। মহারাজাধিরাজের চরণতলে উপস্থিত হইয়া কোন্ মূর্খ ধূলিমুষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবে ? জীবনের যাহা সার—সাধনের যাহা লক্ষ্য—অন্যের নিকটে যাহা পাওয়া যায় না—যাহা পাইলে জীবন শান্তিময়, মধুময় হইয়া যায়—এমন অমূল্য ধনই মায়ের নিকটে চাহিতে হইবে। ব্যাকুল হৃদয়ে চাহিবে—যতদিন না পাও, ততদিনই চাহিবে—অনবরত চাহিবে ; এইরূপে সরলভাবে চাহিতে চাহিতেই

মিলিবে—প্রার্থনা পূর্ণ হইবে—জীবন ধন্য হইবে—সমুদয় অভাব দূর হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত। সাধন-ভজন যথা-সম্ভব গোপনে রাখাই ভাল।

তেঁতুল তলা, বর্দ্ধমান ;
২৫শে বৈশাখ, ১৩২৪। * * *
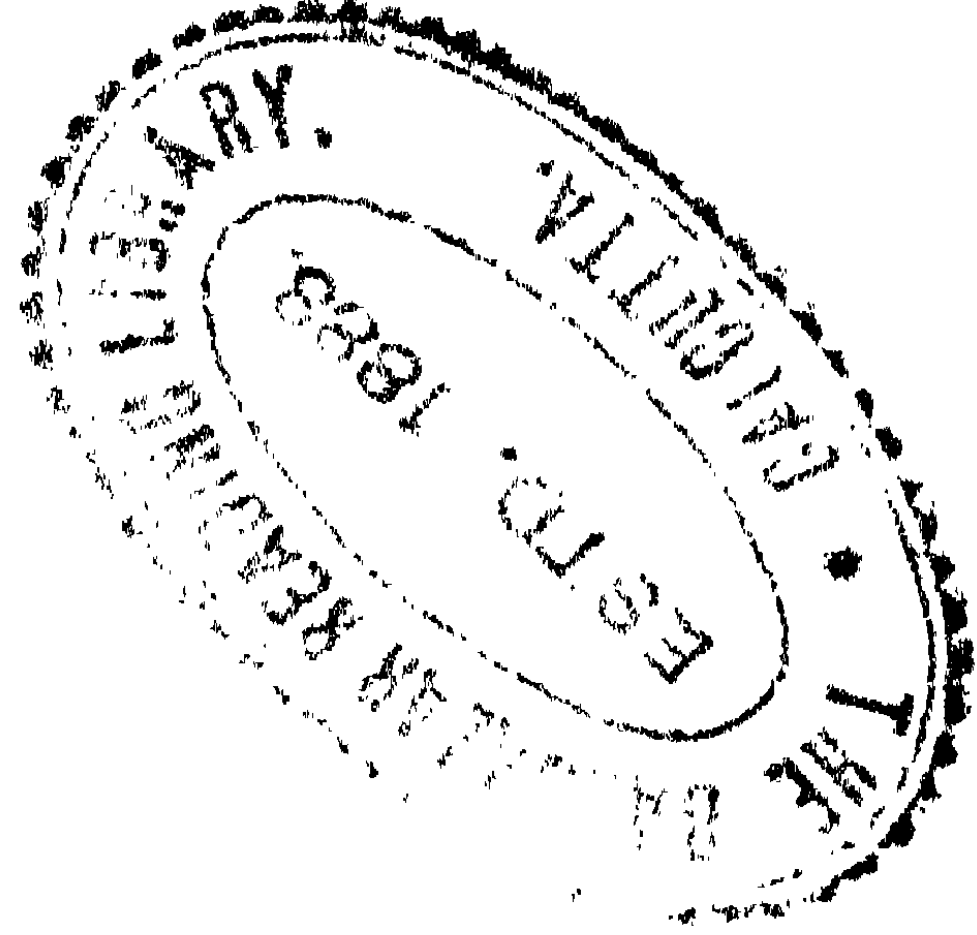
ওঁ

নারায়ণেষু।

উন্নতি-লাভের উপায়

তোমার কর্ম্মই—তোমার স্বনুষ্ঠিত কর্ত্তব্যপরম্পরাই তোমাকে শক্তিপ্রদানে সমর্থ। কর্ম্মজীবন হইতে ধর্ম্ম-জীবনকে পৃথক করা সঙ্গত নহে। নৈতিক জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই আধ্যাত্মিক জীবনের শান্তি-মন্দির বিরাজ করিতে পারে। সত্য ও পবিত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে উন্নত করিবার আশা করিও না। যদি মানব-জন্ম সফল করিবার বাসনা থাকে, তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যেও ন্যায়ের মর্য্যাদা অটুট রাখিতে হইবে। ন্যায়-নিষ্ঠার জন্য সহস্র ক্ষতি স্বীকারেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সত্য ও পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে, সমুদয় আরাম-বিরাম এবং স্বার্থবাসনার পরিহারে কৃতসংকল্প হইতে হইবে। এ যত দিন না পারিবে, তত দিন তোমাকে শ্রেষ্ঠতম অধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। পশুধর্ম্ম পরিহার করিয়া মনুষ্যধর্ম্ম গ্রহণ কর; প্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করিয়া সংযম ও বিচারের আশ্রয় গ্রহণ কর; বৃথা পরিতাপে সময়ক্ষেপ না করিয়া, প্রবল-পুরুষকার-সহায়ে বিঘ্নরাশির

উন্মূলনে যত্নবান হও; সর্ব্বোপরি ভগবানের নিকটে সরলান্তঃকরণে সিদ্ধি-লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে থাক ;—ইহাই তোমার পক্ষে সমীচীন পন্থা ; সুখ-লাভের, শান্তি-লাভের, দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য তোমার পক্ষে অন্য কোন পথ নাই। ঐ পথে চলিতে চলিতে যখনই চরণে দুর্ব্বলতা অনুভব করিবে, ভগবানের নাম সে অন্তরায় দূর করিতে সমর্থ হইবে। নামের অসীম মহিমায় বিশ্বাসবান হইও।

বরিশাল।

১০।৭।'১৮

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

পত্র পাইলাম। সমুদয় দুঃখ-কষ্টকে প্রেমময়ের মঙ্গলা-শীর্ব্বাদ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতে যত্নবান হও। জীবনের উন্নতিকল্পে বিঘ্ন-বিপত্তির আবশ্যক আছে; এবং আবশ্যক আছে বলিয়াই দয়াল ঠাকুর সস্নেহে তাহার বিধান করিতে-ছেন। তাঁহার বিবেচনা-শক্তি তোমা হইতে অল্পতর নহে। তোমার উন্নতির জন্য তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি তোমা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক জানেন। 'দুঃখের আকারে যাহা আমাদিগের নিকটে আসে, তাহা আমাদের কল্যাণেরই জন্য'—এ কথা বিশ্বাস কর; তাঁহার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে থাক এবং যথাসাধ্য তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে যত্নবান হও।

দুঃখ প্রেমময়েরই দূত

দুঃখকে সুখেরই নিদান বলিয়া যে মনে করে, তার কাছে আর দুঃখের তীব্রতা কি? 'দুঃখ প্রেমময়েরই প্রেরিত'—এ কথা যে বিশ্বাস করে, তার আর দুঃখে ভয় কি?

এক দম্পতি জাহাজে চড়িয়া ইয়ুরোপের দিকে যাইতে-ছিলেন। হঠাৎ ঝড় উঠিল, সমুদ্র ভীষণাকার ধারণ করিল।

জাহাজ ডুবু-ডুবু হইল। আরোহিগণ আসন্ন-মৃত্যুর ভয়াবহ চিন্তায় কাতর ও বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু উক্ত দম্পতির মধ্যে স্ত্রী দেখিলেন,—তাঁহার স্বামী বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'ন নাই।

স্ত্রী স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী গম্ভীর-ভাবে পকেটস্থ পিস্তল বাহির করিয়া স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধারণ করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "এ আবার কি? ব্যাপার কি? তোমার হয়েছে কি?" স্বামী বলিলেন, "পিস্তল দেখিয়া তোমার ভয় হয় না?" স্ত্রী উত্তর করিলেন, "তোমার হাতের পিস্তল দেখিয়া আমার ভয় হইবে কেন?" স্বামী বলিলেন, "তবে প্রেমময় জগৎ-স্বামীর হাতের ঝড়-তুফান দেখিয়া আমিই বা ভয় করিব কেন?"

আজ এই পর্য্যন্ত; বেশী লেখা অনাবশ্যক। এই একটি কথাই যদি ধরিয়া থাকিতে পার, তবেই তোমার জীবন মধুময় হইবে। আর যদি রাশি-রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর এবং একটি উপদেশও জীবনে আয়ত্ত করিতে না পার, তবে সে অধ্যয়নে ফল কি?

শিবমস্তু। ইতি।

৺কাশীধাম;   * * *

২১।১১।'১৮

ওঁ

নারায়ণেষু।

জানিতে পারিলাম, তুমি ব্যারামে খুব ভুগিতেছ। ব্যারামে ভোগার মধ্যে নূতনত্ব বেশী কিছু নাই; কারণ সংসারে মৃত্যুর মত ব্যাধিও অপরিহার্য্য। তোমার আমার তো দূরের কথা, যে সকল মহাপুরুষ ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শান্তিময়কে লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেহও ব্যাধির কবলে, অল্লাধিক পরিমাণে, নিপতিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের পেটের পীড়া, আচার্য্য শঙ্করের ভগন্দর, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জ্বর-রোগ এবং আধুনিক কালের পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের গলক্ষত,—এ সমুদয়ই তোমরা অবগত আছ। তাই বলিতেছি ব্যারামে ভোগার মধ্যে নূতনত্ব নাই। তবে নূতনত্ব না থাকিলেও বিশেষত্ব কিছু নিশ্চয়ই আছে। মনের অবস্থাই সেই বিশেষত্ব। ব্যারামে ভুগিয়া ভুগিয়া আত্মহারা হইয়াছ কি না, মনের স্ফূর্ত্তি ও শান্তি নষ্ট হইতেছে কি না, তাহাই এ স্থলে জ্ঞাতব্য। কেহ কেহ অল্প কষ্টেই অধীর হইয়া থাকে বটে; কিন্তু, আমার ধারণা, তুমি সে দলের লোক নও। তোমার ব্যাধি যদিও কঠিন বটে,

শারীরিক দুঃখ অপরিহার্য্য

দুঃখে ধৈর্য্য

যদিও তুমি অনেক কাল যাবৎ ভুগিতেছ, তথাপি মনে হয়, ধৈর্য্য এবং উৎসাহকে পরিত্যাগ করা যেন তোমার উপযুক্ত নয়; হতাশ এবং নিরুদ্যম হওয়া যেন তোমার 'ক্ষ্যাপা' নামের, 'যতীন্দ্র' নামের যোগ্য নয়। যাঁহারা ধর্ম্ম-রাজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে প্রেমময় যাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন, তাহার প্রতিই অনেক সময়ে ভীষণ পরীক্ষার কঠোর বজ্র নিক্ষেপ করেন। প্রহ্লাদের প্রতি কতই না অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঐ সকল অত্যাচারই তো প্রহ্লাদকে আমাদের সমক্ষে গৌরবান্বিত করিয়াছে! যে যত উপরের শ্রেণীতে পড়ে, তার পরীক্ষা তত কঠিন; তাই, যন্ত্রণার ভীষণতায় তোমার উৎসাহ না বাড়িয়া বরং কমিবে কেন? আরও এক কথা—যতটুকু যন্ত্রণা সহ্য করিতে আমরা বাস্তবিকই অসমর্থ, ততটুকু যন্ত্রণা প্রেমময়, জ্ঞানময়, বিশ্ব-বিধাতা কি আমা-দিগকে প্রদান করিতে পারেন? একজন সধারণ রজকও তার গর্দ্দভের পিঠে এত বড় কাপড়ের বোঝা চাপায় না, যাহাতে তার পিঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে;—আর ভগবান তাঁর প্রিয় সন্তানের উপর অসহনীয় বোঝা চাপাইয়া দিবেন, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? আমরা অনেক সময়েই হতাশ হইয়া আত্মহারা হই, নিজের শক্তি-সামর্থ্য ভুলিয়া যাই। অতীতে যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, ভবিষ্যতে যে কষ্ট ভোগ করিবার সম্ভাবনা, তৎসমুদয়কে কল্পনার সাহায্যে বর্ত্তমানের সামান্য

দুঃখের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইয়া বর্ত্তমানের বোঝাটিকে বহনের অযোগ্য বলিয়া মনে করি। ইহা আমাদের বিচারের দোষমাত্র। অতীতে যত আহার করিয়াছি, ভবিষ্যতে যত আহার করিব, তৎসমস্ত একত্র হইয়া কি বর্ত্তমানে আমার উদরাময় জন্মাইতে সমর্থ? ভাবিয়া দেখ, বর্ত্তমানের কষ্টটুকু সহ্য করিতে তুমি বাস্তবিকই সমর্থ কি না। যদি ধৈর্য্যের সহিত পরীক্ষা কর, দেখিবে—প্রতি মুহূর্ত্তেই তৎ-সময়ের দুঃখটুকু সহ্য করিতে তুমি সম্পূর্ণ সক্ষম। আর সহ্য তো সর্ব্বদাই করিতেছ, কেবল কতকগুলি আহা-উহু, কতকগুলি দুর্ভাবনা এবং কতকগুলি কাল্পনিক বিভীষিকার চিন্তা মিশ্রিত করিয়া অনর্থক বিলাপে শরীর-মন ক্ষয় করিতেছে। প্রতিক্ষণই তার দুঃখ-কষ্টের বোঝা লইয়া পর-ক্ষণের পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতেছে, তবে আর দীর্ঘকালের কষ্ট বলিয়া কষ্টকে অসহনীয় মনে করিবে কেন? মন স্থির কর, প্রতিজ্ঞা কর—'আমি অবিকৃত চিত্তে এ কষ্ট সহিব', চিন্তা কর—'আমি এই কষ্টটুকু সহিতে পারিব না কেন?' তাহা হইলেই দেখিবে—কষ্ট আর তোমাকে বেশী কষ্ট প্রদান করিতে পারিবে না। আরও বিচার কর—'আমাদের কষ্ট কতটুকু? প্রহ্লাদের প্রতি যত অত্যাচারের বোঝা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সহস্র রোগের মধ্যেও কি ঐরূপ বোঝা আমার উপরে আপতিত হইয়াছে? যবন হরিদাসের প্রহার-যন্ত্রণার মত কোনও কষ্ট কি আমি ভোগ করিয়াছি?

তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত সুধন্বার মত ক্লেশ আমাকে কি কখনও ভুগিতে হইয়াছে? ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে করিলে আমার যন্ত্রণা কত লঘু হইয়া যায়!' তাই, আশ্বস্ত হও, নিজকেই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য মনে করিও না। আরও এক কথা। সক্রেটীজ্ যখন স্বহস্তে বিষ পান করিয়া হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ করিতেছিলেন, তখন কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল,—"ভীষণ মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াও আপনি বদনের প্রসন্নতা রক্ষা করিতেছেন কিরূপে?" সক্রেটীজ্ প্রফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন, "এই দেহ বরাবরই আমার শত্রুতা করিয়াছে; ধর্ম্ম-কার্য্যে, সাধু-উদ্দেশ্য-সাধনে কত বিঘ্নই ঘটাইয়াছে; ক্ষুধা ও পিপাসা, নিদ্রা ও তন্দ্রা, জরা ও ব্যাধি, আলস্য ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বদাই আমাকে অসুবিধাগ্রস্ত করিয়াছে। আজ সেই চির-শত্রুর হাত হইতে নিস্তার পাইয়া শান্তিময়ের সহিত মিলিত হইব, ইহা অপেক্ষা সুখের কথা, আশার কথা, সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে?" বাস্তবিকই সংসারে দুঃখ ও কষ্ট, ব্যাধি ও মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, তখন বিলাপে সময়-ক্ষেপ না করিয়া যাহাতে ইহাদের হস্ত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারি, এমন চেষ্টাই কি কর্ত্তব্য নয়? এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভারতের ব্রাহ্মণগণ, ঋষিমুনিগণ সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া হরি-চরণ-স্মরণে দেহ-মন সমর্পণ করিয়া থাকেন। তুমিও ব্রাহ্মণ-সন্তান, তুমিই বা ইহাতে

দুঃখের চির-নিবৃত্তি

পশ্চাৎপদ হইবে কেন? যে শক্তি ও সুযোগ পাইয়াছ, তাহা যত সামান্যই হউক্ না কেন, এই উদ্দেশ্য-সাধনে নিয়োজিত কর। ইহার সদ্ব্যবহার যদি না কর, তবে এতদপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও সুযোগের দাবী করিবার অধিকার কি? তুমি হয়ত বলিবে, 'এই রুগ্ন দেহ ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কি সেই তপস্যা করা সম্ভব, যদ্দ্বারা চিরশান্তি লাভ করা যায়?' কিন্তু, তোমার এ কথা, তোমার এ প্রশ্ন নিতান্তই বালকোচিত। তপস্যা যতই কর না কেন, কোটি-কোটি বৎসর কঠোর তপস্যায় কাটাও না কেন, কিছুই শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার পক্ষে প্রচুর নহে। তপস্যারূপ মূল্য দ্বারা ভগবানকে কিনিবে,— ইহা অসম্ভব কথা, হাস্যকর উক্তি। ভগবানের কৃপাদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে। সে কৃপা সম্পূর্ণ রূপেই তাঁর ইচ্ছা-সাপেক্ষ; তাহা তোমার শক্তি বা সময় সাপেক্ষ নহে। পরীক্ষিৎ সাত দিন মাত্র ভাগবৎ-শ্রবণেই শান্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবানের করুণায় এক মুহূর্ত্তেই জীবন ধন্য হইতে পারে। কাজেই, 'আমার সময় নাই, শক্তি নাই, সুযোগ নাই,'—এ বলিয়া আক্ষেপে সময়-ক্ষেপের আবশ্যক নাই। অন্য চিন্তা, অন্য কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার কৃপা-লাভের জন্য, দিবা-রাত্রির যতক্ষণ সম্ভব, তাঁহার চরণই স্মরণ করিতে থাক। সর্ব্বদার জন্য তাঁহারই পদাশ্রয় করিতে সচেষ্ট হও। তাঁহাতে আত্ম-বিসর্জ্জনের জন্যই

ভগবৎ-কৃপাই শান্তি-লাভের মূল

ভগবৎ-স্মরণ

তোমার সমুদয় শক্তি নিয়োজিত কর। তাঁহার নাম, যতক্ষণ সম্ভব, মুখে বা মনে উচ্চারণ কর। তাঁহার দিব্য মধুর মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা কর এবং সে মূর্ত্তির নিকটে মনে মনে পূজা কর, প্রার্থনা কর, আত্ম-নিবেদন কর। সে মূর্ত্তির সহিত কথা কও, আব্দার কর, ক্রীড়া কর। তাঁহার হাস্য-বদন মানস-নয়নে নিরীক্ষণ কর। তাঁহার সান্নিধ্য সর্ব্বদা অনুভব ও স্মরণ করিতে বিশেষভাবে যত্নবান হও। প্রত্যেক কর্ম্মে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি কর। প্রত্যেক শরীরকে তাঁহারই মন্দির মনে কর। প্রত্যেক শব্দে তাঁহারই বংশী-ধ্বনি শ্রবণ কর। তিনিই ডাক্তারের শরীরে চিকিৎসক রূপে, আত্মীয়-বন্ধুগণের শরীরে সেবকরূপে কর্ম্ম করিতেছেন,—ইহা ধারণা কর এবং তাঁহার প্রেম-হস্ত প্রত্যেক ব্যাপারে দর্শন করিতে চেষ্টা কর। দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে তাঁহার মঙ্গল হস্তেরই ইঙ্গিত অনুভব কর; এবং তুমি সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বারা রক্ষিত ও পালিত, ইহা বিশ্বাস কর। তাঁহার মহিমা স্মরণ কর, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর এবং তাঁহার গাথা শ্রবণ কর। যাহাতে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়, এমন পুস্তক সম্ভব হইলে পাঠ কর। আর, যখনই দুর্ব্বলতা বোধ করিবে, হতাশতা আক্রমণ করিবে, সন্দেহ আসিবে, তখনই তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর এবং তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের অনুধ্যান কর। এই ভাবে যদি চলিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, তোমার জীবন শান্তিময়, মধুময় হইয়া

যাইবে। পওহারী বাবাকে যে সাপটী দংশন করিয়াছিল, সেইটীকে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "এটী প্রেমময়ের দূত"। আশা করি তুমিও বলিতে পারিবে—'এই যে রোগ ও শোক, এই যে দুঃখ ও দৈন্য, এই যে জরা ও মৃত্যু, ইহারাও প্রেমময়ের দূত।' 'জীবন থাক্ বা মৃত্যু আসুক্, তা'তে আমার কি ? আমি যত পারি, তাঁহাকে স্মরণ করিব। যতদিন শরীর থাকিবে, তাঁহার চিন্তা করিয়া কাটাইব ; তারপর, যখন এ শরীর ছুটিয়া যাইবে, তাঁহারই সহিত মিলিত হইব'। তিনিই এ শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এ শরীরের চিন্তা তিনিই করুন। আমার কর্ত্তব্য—তাঁহার চিন্তা করা, আমি কেবল তাহাই করিব।'—এই প্রকার প্রতিজ্ঞাই তোমার হউক্। আশা করি, এই ভাবে চলিয়া এ অগ্নি-পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইবে। বিশ্বাস করিও,—তুমি ভগবানের প্রিয় সন্তান, কোলের ছেলে ; তুমি পরিত্যক্ত নও ; তিনি তোমার সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস কর, নির্ভর কর। আজ এই পর্য্যন্ত। শিবমস্তু। ইতি।

স্বর্গাশ্রম ;
১৯শে পৌষ,
১৩২৬।

* * *

ওঁ

নারায়ণেষু।

নিত্য, নির্ব্বিকার ভগবানই সৎ; আর যা কিছু, সকলই অসৎ। ভগবৎ-সঙ্গই সৎসঙ্গ; বিষয়-সঙ্গই অসৎসঙ্গ। তোমার শরীর কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকুক্ বা না থাকুক্, তোমার নিকটে কেহ বা কিছু থাকুক্ বা না থাকুক্, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। তোমার মন যদি ভগবৎ-স্মরণ করিতে থাকে, তবেই তোমার সৎসঙ্গ; আর তোমার মন যদি ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া বিষয়-সেবা করিতে থাকে, তবেই তোমার অসৎ সঙ্গ। কাজেই, সৎসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ করা সম্পূর্ণরূপে তোমার মনের উপরই নির্ভর করিতেছে। যেখানেই থাক, সেখানে কোন সাধু-মহাজন উপস্থিত থাকুন্ বা না থাকুন্, তোমার ইচ্ছা হইলেই তুমি অনায়াসে সৎ-সঙ্গের সুধাময় ফল ভোগ করিতে সমর্থ।

তবে আমাদের কাঁচা মন সততই বিষয়ের দিকে ধাব-মান। প্রযত্ন-বলে ইহাকে ভগবানের দিকে টানিয়া লইতে হইবে। তাই, যাহার নিকটস্থ হইলে মন চঞ্চল হয়, ভগ-বানকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিবার চেষ্টাই এখন সঙ্গত। আর, যাঁর কাছে বসিলে মন পবিত্র

হয়, ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যও যথাসম্ভব চেষ্টা বর্ত্তমানে অপ্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু সর্ব্বদাই আসল কথাটী মনে রাখা চাই,—ভগবানে সর্ব্বদা মন লাগাইবার চেষ্টা করা চাই।

সাধনা। ভক্তি-শাস্ত্র হইতে ভগবানের মহিমার বিবরণ পাঠ কর, সম্ভব হইলে সরল-হৃদয় ভক্তগণের নিকট হইতে তাঁহার প্রেম-লীলার মধুময় কাহিনী শ্রবণ কর, সত্য-কাম বন্ধু-গণের সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা কর, এবং নির্জ্জনে বসিয়া ভগবন্মাহাত্ম্যের চিন্তা কর। নিকটে যদি কোন মন্দির থাকে, মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া ইষ্টদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কর। স্তোত্র এবং নাম-মালা আবৃত্তি কর এবং ভক্তিবর্দ্ধক সঙ্গীত গান কর। যখনই সম্ভব, ভগবানের নাম চিন্তা বা উচ্চারণ কর এবং সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর। কখনও বা কাগজ-পেন্সিল লইয়া তাঁহার মূর্ত্তি অঙ্কিত কর। যে গৃহে বাস কর, তাহার প্রাচীরের কোন উপযুক্ত স্থানে ইষ্টদেবতার এক মনোহর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর, পুষ্পাদি দ্বারা তাহা সজ্জিত কর, বারংবার তাঁহাকে দর্শন কর এবং সময়ে সময়ে প্রণাম কর। মনে মনে ভগবানের দিব্য-মধুর-মূর্ত্তির চিন্তা কর, মনঃকল্পিত উপকরণে তাঁহাকে পূজা কর, এবং তাঁহার নিকটে আত্ম-সমর্পণ কর। ভোজনের প্রাক্কালে আহার্য্য দ্রব্য ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া, তাঁহারই প্রসাদ ভক্ষণ কর।

তাঁহার সহিত কথা কও, আমোদ কর, আব্‌দার কর, ভ্রমণ কর। ভক্তের সহিত ভগবানের লীলা-বিলাস শান্ত মনে অনুধ্যান কর। চলিবার সময়ে মনে কর—তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। পড়িবার সময়ে মনে কর—তিনি সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তোমার পড়া শুনিতেছেন। লিখিবার সময়ে মনে কর—তিনি কাছে থাকিয়া তোমার লেখা দেখিতেছেন। ঘুমাইবার পূর্ব্বে শয়ন করিয়া চিন্তা কর—তিনি প্রসন্ন বদনে তোমার দিকে তাকাইয়া আছেন। প্রত্যেক কর্ম্মের সময়ে স্মরণ কর—তিনি তোমার কর্ম্ম এবং ভাব দর্শন করিতেছেন। কোন জীব-শরীর নয়ন-গোচর হওয়া মাত্রই চিন্তা কর—উহার হৃদয়ে তোমার প্রিয়তম ইষ্টদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। বাগানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া মনে কর—ভগবান ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাঁহার চরণোপরি ঐ ফুলগুলি শোভা পাইতেছে। এক দিন যিনি তমালের তলে, যমুনার কূলে বসিয়া কতই লীলা করিয়াছেন, কতই বাঁশী বাজাইয়াছেন, তিনিই সম্মুখস্থ তরু-শাখায় উপবিষ্ট আছেন, তিনিই নদীর তীরে নৃত্য করিতেছেন! ঐ যে কেমন সুন্দর পুষ্পটী নির্ম্মাণ করিয়া এইমাত্র গোপনে জঙ্গলের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন! ঐ যে সন্ধ্যার আবরণে লুক্কাইত থাকিয়া ঐ ফুলটিকে প্রস্ফুটিত করিতেছেন! ঐ যে আকাশে কত রকমের রঙ লাগাইতেছেন, আর চঞ্চল বালকের মত কেবলই

রঙ্ বদ্‌লাইতেছেন! ঐ যে, কত মনোযোগ সহকারে, কত সুন্দর সুন্দর নক্ষত্র আঁকিতেছেন! ঐ যে শারদীয় রজনীর হাস্যময়ী জ্যোৎস্না, ঐ যে স্রোতস্বিনীর সুন্দর তরঙ্গ-ভঙ্গ, ঐ যে মৃদু-মধুর মলয়-হিল্লোল, ঐ যে মনোহর কারু-কার্য্য-সমন্বিত সুন্দর কিশলয়, ঐ যে রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন বালকটীর অনিন্দ-সুন্দর মুখ-কান্তি,—এ সকলই যে তাঁহা-রই রচনা; এ সকলে যে তাঁহারই সৌন্দর্য্যের, তাঁহারই নৈপুণ্যের, তাঁহারই মহিমার আংশিক প্রকাশ। এই যে অনন্ত ভাব-প্রবাহ, এই যে অনন্ত কর্ম্ম-স্রোত—এ ত তাঁহারই লীলা-বিলাস। মেঘের গর্জ্জনে, নদীর কুলুধ্বনিতে, ষ্টীমার-গমন-শব্দে তাঁহারই নাম ধ্বনিত হইতেছে, মনে কর। সদ্য-প্রসূত বালকের ক্রন্দনে ও মৃত্যু-শয্যায় শায়িত রোগীর আর্ত্তনাদে প্রণব-ধ্বনি শুনিতে চেষ্টা কর।

আর কত বলিব? ভাবের চশ্‌মা পরিয়া লও। অনন্তভাবময় ভগবানকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট হও। নানা রূপে, নানা ভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাকেই দর্শন কর। এইরূপ সৎসঙ্গ করিতে করিতেই ভগবানে অনুরাগ জন্মিবে এবং ক্রমে বাড়িবে। তার পর যখন প্রেম-মধু তোমার হৃদয়-পঙ্কজকে পরিপূর্ণ করিবে, তখন ভগবৎ-ভৃঙ্গের এমন শক্তি থাকিবে না, যদ্দ্বারা সেই অম্বুজাসন ক্ষণকালের জন্যও সে পরিত্যাগ করিবে।

পত্র কেবল পড়িলেই হইবে না। কাজ কর, কাজে

লাগিয়া থাক। মনের চঞ্চলতায় তাঁহারই লীলা-বিলাস স্মরণ করিয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাও। এরূপেও যখন মনকে শান্ত করিতে পারিবে না, বিচারাদির সাহায্যেও যখন উদ্দাম মনকে সংযত করিতে অসমর্থ হইবে, তখন তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা কর। বিঘ্ন-বিপত্তিতেও মঙ্গলময়েরই হস্ত দর্শন কর। সুখ-শান্তিতে তাঁহারই নিকটে কৃতজ্ঞ হও। সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁহারই দাস ভাবে, তাঁহারই প্রীতি কামনায়, সমুদয় কর্ত্তব্য যথাসময়ে, যথানিয়মে, সুচারু রূপে সম্পন্ন কর

কন্‌খল্‌,
২৩।৯।'১৭ ।